# সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
চতুর্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ● এপ্রিল ২০১৮ ● পাঁচ টাকা


## যাদের হাত চললে পেট চলে

আজকের চাষী কালকের দিনমজুর-ক্ষেতমজুর। ফসল ফলিয়ে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারা আবার কিনতে গিয়ে বেশি দামে কেনা। একবার বিক্রি করতে গিয়ে ঠকে আরেকবার কিনতে গিয়ে ঠকে। দুইবার ফসল ফলানোর পরে জমি চলে যায়। এই যে নিয়ম চলছে তারই ফল – একসময়ের চাষী আর একদিন সব হারিয়ে ক্ষেতমজুর ও দিনমজুর। তারপরও বিয়ে, অসুখ, নদী ভাঙ্গন, মামলা ইত্যাদিতেও জমি যায়। ফলে এদের হাত চললে পেট চলে; হাত না চললে পেট চলে না। এই যে পেটের জন্য হাত চলা, তার যোগারও নেই। *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হামলার তীব্র নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সিরিয়ায় সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন স্থাপনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "মিথ্যা অভিযোগে জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে সিরিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের একতরফা হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য যে অভিযোগে হামলা চালানো হয়েছে তা তদন্তের Organization for Prohibition of Chemical Warfare (OPCW)-এর পরিদর্শক দল সিরিয়ায় পৌঁছেছে। কিন্তু তাদের তদন্তের জন্য অপেক্ষা করা হয়নি। সিরিয়ার সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সিরিয়ার মিত্র রাশিয়া বলেছে তাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের যোগসাজশে কারা কীভাবে রাসায়নিক হামলার নাটক সাজিয়েছে। বেশ কিছু স্বাধীন সাংবাদিকের বরাতে জানা গেছে, বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ঘৌতার দ্যুমায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি স্থানীয় হাসপাতালগুলোতেও এ ধরনের আক্রান্ত কোনো রোগী পাওয়া যায়নি। অতীতে এই সাম্রাজ্যবাদীরাই ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে বলে মিথ্যা তথ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। সম্পদ লুটপাট করেছে।

প্রকৃত ঘটনা হলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয়তাবাদী ও সেক্যুলার আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিরিয়াকে বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় মার্কিন-বৃটিশ-ফ্রেন্স জোট। এই অপচেষ্টার অংশীদার সৌদি-কাতার-তুরস্ক ইত্যাদি আঞ্চলিক শক্তিগুলো। গত ৭ বছর ধরে আসাদবিরোধী শক্তি আইএস-আল কায়েদাসহ বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র-অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে এই দেশগুলো। কিন্তু রাশিয়া ও ইরানের সহযোগিতায় সিরিয়ান সেনাবাহিনী ও জনগণ তা প্রতিরোধ করে চলছে। এখন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। এ অবস্থায় দেশে দেশে দেশপ্রেমিক ও যুদ্ধবিরোধী জনগণের শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই কেবল ইরাক, লিবিয়া ও আফগানিস্তানের মতো ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে সিরিয়াকে বাঁচাতে পারে।"

## গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ভিটেমাটি রক্ষার আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণ

ঘুষঘুষে আগুন অনেকদিন ধরেই জ্বলছে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে। এ আগুন ভিটেমাটি রক্ষার, ফসলি জমি রক্ষার। বাস্তুভিটা রক্ষার চলমান আন্দোলনে গত ১০ এপ্রিল পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করেছে। লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল তো মেরেছেই, গুলিও ছুড়েছে। এ ঘটনায় ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। আহত হয়েছে অনেকে।

সুন্দরগঞ্জে বেক্সিমকো কোম্পানি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মানের নামে দখল করছে কৃষকদের ফসলি জমি। ছলে-বলে, লোভ দেখিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাদের শত প্রজন্মের বসত ভিটা থেকে। *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

### প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কোটা বাতিলের ঘোষণা অযৌক্তিক

## অভূতপূর্ব ছাত্রআন্দোলন দেখল দেশের জনগণ

ব্যবহৃত রাবার বুলেট আর টিয়ারশেলের কৌটা পড়ে আছে রাস্তায়। টিয়ারশেলের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে চোখের তীব্র জ্বালা আর শ্বাস বন্ধ হবার যোগার। শাহবাগ থেকে পুরো ক্যাম্পাসে একই অবস্থা। বৃষ্টির মতো ছোড়া হয়েছে রাবার বুলেট। চালানো হয়েছে অকথ্য লাঠিচার্জ। বুকে, পিঠে, চোখে লেগে মারাত্মক আহত হওয়া দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী ততক্ষণে হাসপাতালে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইট, কাঠ, পাথর, বাঁশ। স্থানে স্থানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। গত ৮ এপ্রিল রাত ১০টায় শাহবাগের চিত্র এটি। কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি নির্মমতার প্রতিচ্ছবিও। এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ এখানেই থেমে থাকেনি। চলেছে রাতভর। পুলিশের সাথে পরে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। চলেছে যৌথ সন্ত্রাসী কার্যক্রম। পরবর্তীতে এদের কিছু না হলেও অজ্ঞাতনামা কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ৪টি মামলা করা হয়েছে।

যাদের উপর এমন পুলিশ-ছাত্রলীগ দিয়ে নির্যাতন চালানো হলো, কিংবা কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর ভাষায় যারা 'রাজাকারের বাচ্চা', তারা আসলে কারা? কী ছিল তাদের দাবি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## এই 'উন্নয়নশীল' লইয়া আমরা কী করিব?

গ্রাম বাংলার একটি লোককাহিনী সম্ভবত সবারই জানা। সেই যে এক জোলা, কাজকর্ম কিছু করে না। তাকে তার বউ পাঠাল বাজারে ডিম বিক্রি করতে। জোলা ডিমের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বাজারে যেতে যেতে ভাবছে এই ডিম বিক্রি করে সে আরো ডিম কিনবে। তারপর সেই ডিম ফুটিয়ে তার অনেক মুরগি হবে। সেই মুরগিগুলো অনেক ডিম দেবে। এভাবে তার খামার অনেক বড় হবে। মুরগির খামার থেকে গরু-ছাগলের খামার হবে। তার বাড়িতে পাকা দালান উঠবে। সে খাটের উপর শুয়ে শুয়ে পা নাচাবে আর বউকে আদেশ দেবে। বউ যদি কথা না শোনে তাহলে দেবে এক লাথি। ব্যস। সেই কল্পনায় বিভোর হয়ে জোলা যেই লাথি চালালো, মাথায় থাকা ডিমের ঝাঁকা মাটিতে পড়ে সব ডিম গেল ভেঙে।

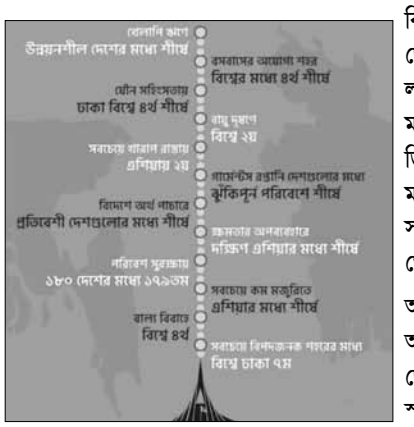


আমাদের অবস্থা অনেকটা ওই জোলার মতো। স্বাধীনতার পর যে সময় দেশের অর্থনীতি, বিশেষত ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে সংকটময় সময় পার করছে তখন আমরা মহাসমারোহে ৭ দিন ধরে 'উন্নয়নশীল' খেতাবের উৎসব করেছি, জনগণের *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## উত্তরবঙ্গের আলুচাষী বাম্পার ফলনও যাদের জীবনে পরিবর্তন আনে না

সন্ধ্যা সাতটা। দিনাজপুরের রাণীরবন্দর বাজার। বাজারের ঠিক উত্তর দিকটায় অগণিত আলু রাস্তায় পরে থাকতে দেখা যায়। সেখানে বিক্রেতার হাক-ডাক নাই। ক্রেতারও ভীড় ঠেলে চাহিদা মতো আলু কেনার চেষ্টা নেই। প্রথম দেখায় মনে হবে, আলু কিনতে বোধহয় আজকাল আর টাকা লাগে না!

রংপুরের তারাগঞ্জের একজন আলুচাষী, তার ছোট্ট ছনের ঘরটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, চৈত্রের রুদ্র মূর্তি কতটা কঠোর হতে পারে। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নেই। থাকবেই বা কেন! এ জীবনে দুঃখ যন্ত্রণার কোনো অন্ত নেই, সমাপ্তি নেই। ফুটফুটে তিনটি সন্তানের ব্যথাতুর চোখের ভাষাও অস্পষ্ট নয়। শৈশবেই তাদের জীবনে কঠিন বাস্তবতা নেমে এসেছে। ওই সংসারে কিন্তু আরও একজন আছে। পড়নের মলিন কাপড়ের মতোই মলিন তার মুখখানি। কেননা তার স্বামী যে আলুচাষী।

প্রতি বছর আলুর বাম্পার ফলন হয়। কিন্তু তা চাষীর জীবনে সুখ নয় কেবল দুঃখ-কষ্টই বয়ে আনে। উদয়াস্ত রক্ত জল করা শ্রম দিয়ে, এনজিও বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নিজের সামান্য জমিতে বা বর্গা জমিতে আলু চাষ করে ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন উত্তরবঙ্গের অনেক কৃষক। কিন্তু উৎপাদনের খরচও তুলতে পারেন না। ক্ষোভে-দুঃখে জমিতেই আলু ফেলে আসেন চাষীরা। ধরিত্রীর অন্ন যোগানদাতাদের সিক্ত কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ শাসকদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। এ এক ভীষণ যন্ত্রণা। এত অপমান, লাঞ্ছনায় বিপন্ন হয়ে যাওয়া এ জীবনের প্রশ্ন তো একটাই, 'আলুচাষীরা কি মানুষ'?

কথা হচ্ছিল জয়পুরহাটের *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## বিউটি আক্তার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড যে কিশোরীর করুণ মৃত্যু অপরাধী করে গেল গোটা সমাজকে

বাইরে যখন উন্নয়নের মিছিল, দেশ জুড়ে যখন নারীর ক্ষমতায়নের গল্প তখনই কোনো এক তরুণীর চিৎকারে হয়তো বাতাস স্তব্ধ হয়ে পড়ছে, তার কান্নায় আক্রান্ত হচ্ছে সভ্যতার ছন্দ, তার বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে কোনো হিংস্র মানুষরূপী পশুর তীক্ষ্ণ থাবায়। পৈশাচিকতার কত ঘটনা আমরা জেনেছি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। মায়ের সামনে মেয়েকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। এই অপকর্ম করেছিল পাকিস্তানি সেনা, বাঙালি রাজকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী। নারীর প্রতি এই অপমান সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমন বহু মূল্যে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীন দেশেও কি সেই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? হয়নি। কেননা ভূ-খণ্ডের মালিকানা পরিবর্তিত হলেও পাল্টায়নি ব্যবস্থাটা। যে ব্যবস্থা নারীকে অপমান করে, ঘরে বন্দি রাখতে বলে, পণ্যসামগ্রী বানায় – সেই ব্যবস্থা পাকিস্তানেও ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশেও আছে। ফলে নারীর অপমান-অপদস্ত হবার অবস্থা নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাই তো এখন কেবল ধর্ষণ নয়, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়ার মতো নৃশংস ঘটনা হর-হামেশা ঘটছে। মধ্যবয়স্ক পুরুষ প্রবৃত্তির লালসা মেটায় তিন বছরের শিশুর উপর। অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীন দেশে নারীর চোখের জল আজও তাই মোছেনি। নারীর এই অপমান প্রশ্নবিদ্ধ করছে গোটা সামাজিক প্রক্রিয়াকে।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে সিলেটের শায়েস্তাগঞ্জে। শায়েস্তাগঞ্জের ব্রাহ্মণডোরা গ্রামের সায়েদ আলীর মেয়ে বিউটি আক্তারকে (১৪) গত ২১ জানুয়ারি বাড়ি *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# অভূতপূর্ব ছাত্রআন্দোলন দেখল দেশের জনগণ

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার সাত কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এই আন্দোলন করেছে, তারা প্রায় সবাই দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। শিক্ষিত হয়ে একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া এদের বড় প্রয়োজন, তাদের প্রতি পরিবার-পরিজনের প্রধানতম প্রত্যাশা। পরিবারগুলোর সবচেয়ে বড় বিনিয়োগের জায়গাও তাদের পড়াশুনা। তারাই নেমেছিল এই আন্দোলনে একটি যৌক্তিক দাবি তুলে ধরে। দাবিটি ছিল বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের। কিন্তু অন্য আরও অনেক দাবির মতো তাদের দাবিও সরকার এতদিন কর্ণপাত করেনি। একগুয়েমি দেখিয়ে বলেছে 'কোটা সংস্কারের কোনো সুযোগ নেই।'

শুধু এতটুকুতেই সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সন্তুষ্ট থাকেননি। অন্যান্য সময়ের মতো আন্দোলনকারীদের 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ' বলে ভাগ করার চেষ্টা করেছে। আন্দোলনকারীদের 'জামাত-শিবির কর্মী', 'বিএনপি'র স্বার্থরক্ষাকারী', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতাকারী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' ইত্যাদি নানা কিছু বলে বাস্তবে সারাদেশের মানুষ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের অপমান করেছে। কিন্তু জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়বোধ থাকলে তারা বুঝতে পারতো – কতটা পতিত দশার কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এভাবে আন্দোলনে যুক্ত হলো। বুঝতো, সরকারের উন্নয়নের গল্পের ভাগীদার এই ছেলে-মেয়েরা বা তাদের পরিবার-পরিজন নয়। দেখতে পেত, একদিকে সম্পদ-বিত্ত-বৈভবের পাহাড় জমা হলেও লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা আজও তাদের শিক্ষাগ্রহণের দিনগুলোতে হলে-মেসে থাকে কষ্ট করে, বাসে-ট্রেনে ঝুলে যাতায়াত করে, খেয়ে-না খেয়ে তাদের স্বপ্নগুলো বাঁচিয়ে রাখে শিক্ষা শেষে কাজের আশায়। তাদের বৃদ্ধ বাবা-মায়েরাও দিন গোনে সন্তানের মাধ্যমে কষ্টের দিনগুলো পাল্টানোর। কিন্তু সে ব্যাকুলতা শোনার সময় কোথায় সরকারের? তারা ব্যস্ত ষড়যন্ত্র খুঁজতে। তাই তো পুলিশ আর সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিতে পেরেছে তারা।

কিন্তু এটা ঘটনার একটা দিক মাত্র। এবারের কোটা আন্দোলন দেখিয়েছে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার নমুনা। যুক্তির শক্তি আর সাহসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে যেকোনো দমন-পীড়ন-নির্যাতন যে রুখে দেয়া যায়, তেমন দুর্দমনীয় শক্তির স্ফূরণ। দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে আসাতে কোটা সংস্কারের আন্দোলন বাস্তবে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। ঢাকা শহর কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। এতে জনগণের কষ্ট হয়েছে সত্যি। কিন্তু তবুও এ আন্দোলনে ছিল তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। পথচারীরা আন্দোলনকারীদের পানি, খাবার দিয়েছে। জানিয়েছে তাদের আবেগের কথা। আন্দোলনকারীরাও জরুরি সেবা নিতে যাওয়া যাত্রীদের, অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগীদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলাচলে সহযোগিতা করেছে। আন্দোলন যে উচ্চ সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তাও দেখা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা রাতভর একসাথে রাজপথে থেকেছে। কিন্তু কোথাও শোনা যায়নি লাঞ্ছনা-অপমানের কথা। স্লোগানে মুখরিত ছিল ক্যাম্পাস। একে দাঁড়িয়েছে অন্যের প্রয়োজনে। এক খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছে। তথাকথিত বড় ভাই-বোনদের চরম অপমান-নিপীড়নের পরও যারা এতদিন সবকিছু মুখ বুজে সয়েছে, তারও চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করেছে, সকল বাধা উপেক্ষা করে আন্দোলনে এসেছে। ভাইদের আহত হবার কথা শুনে রাত ১টায় হলের তালা ভেঙে বেড়িয়ে এসেছে বোনেরা। সুফিয়া কামাল হলে ছাত্রী নির্যাতনের খবর পেয়ে মধ্যরাতে ছুটে গেছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হল, ক্যাম্পাস সন্ত্রাসী আর দখলদারী শক্তির আখড়া, যেখানে 'গেস্টরুম কালচারের' নামে চরম শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালানো হয়, যেখানে ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে হলে অবস্থান করা দুঃসাধ্য – সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এভাবে রাস্তায় নেমে পড়াটা ছিল বহুদিনের অচলায়তন ভেঙে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে দাঁড়ানো। পরিস্থিতি এমন ছিল, আন্দোলনের চাপে সুফিয়া কামাল হলের ছাত্রলীগের সভাপতিকে ছাত্রী নির্যাতনের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! কী নির্ভয়, আর কতটা মানবিক!

শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। কেননা বাংলাদেশে সরকারি তথ্য মতেই প্রায় ৪ কোটি ৮২ লক্ষ বেকার। প্রতিবছর শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে ১২-১৫ লক্ষ যুবক-যুবতী। নতুন কর্মসংস্থান প্রায় নেই, সরকারি চাকুরির সুযোগ ভীষণ অপ্রতুল। বেশিরভাগ বেসরকারি চাকুরিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা বলে প্রায় কিছু নেই। তাই তরুণ-তরুণীরা হন্যে হয়ে 'সোনার হরিণ' হয়ে ওঠা সরকারি চাকুরির জন্য ছুটছে। এরকম অবস্থায় জেলা কোটা, নারী কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটা, উপজাতি কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা ইত্যাদি প্রায় ২৫৮ ধরনের কোটার ব্যবস্থা রেখেছে সরকার। সরকারি চাকুরিতে কোটার ভাগ ৫৬%। মেধার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ আছে মাত্র ৪৪ শতাংশের। অর্থাৎ সাধারণের চেয়ে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদেরই সুযোগ বেশি। ফলে বৈষম্য বেড়েছে প্রকটভাবে। অথচ বিশেষ অংশের জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা প্রথা চালু হবার পিছনে কারণই থাকে বৈষম্য দূর করা। কোটাকে বলা হয় Positive discrimination। অর্থাৎ আপাত অর্থে বৈষম্য মনে হলেও এটা আসলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বৈষম্য দূর করারই একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু এমনটা হয়নি আমাদের দেশে। বিশেষ অংশের সুবিধা দেবার নামে বৈষম্যই বেড়েছে। তাই কোটা প্রথা সংস্কারের দাবি উঠেছে। দেশের সকল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু টনক নড়েনি সরকারের।

১৯৭২ সাল থেকে চালু হওয়া কোটা প্রথায় অন্যান্য কোটার সাথে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা' ছিল। আজও আছে। সেদিন কেবল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের জন্য এই সুবিধা দেয়া হয়েছিল, এখন ঘোষণা করা হয়েছে তাদের নাতি-পুতিরাও এই সুবিধা পাবে। এই কোটার হার ৩০ শতাংশ। ১৯৭২ সালে গণপরিষদ বিতর্কে 'আহত ও পঙ্গু' মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটার সুবিধা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটা সকল মুক্তিযোদ্ধার জন্য কার্যকর করা হয়। এর মাধ্যমে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভক্তি টানা হয়েছে। অথচ সংবিধানেও এভাবে কোটা সুবিধার ব্যাপারে কিছু বলা নেই। নাগরিকের মধ্যে যে 'অনগ্রসর' অংশের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে তার মধ্যে সকল মুক্তিযোদ্ধারা পড়েন না। আবার একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্য লড়েছেন কিন্তু এর সুফল কেবল তার নাতি-পুতিরা পাবে কেন? এই সুযোগ কি তাদের জন্য সুবিধা নয়? আহত ও নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য কোটা সুবিধা থাকতেও পারে। কিন্তু ঢালাওভাবে সকলের জন্য এবং বিশেষত তাদের কয়েক প্রজন্মের জন্য এই সুবিধা যৌক্তিক হতে পারে না।

মুক্তিযোদ্ধা কারা – সেটাও কি ঠিক করতে পেরেছে সরকার? যিনি অস্ত্র নিয়ে সম্মুখ সমরে ছিলেন তিনি যেমন যুদ্ধ করেছেন, তেমনি যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনিও এই সংগ্রামের অংশীদার। অল্প কিছু রাজাকার-আলবদর ছাড়া কোটি কোটি জনগণ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এই সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন, ২ লক্ষ নারীকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। স্বীকৃতি দিতে হলে তো এদের প্রত্যেককেই দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সঠিকভাবে আজও নির্ণীত হয়নি। একেক সরকারের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা পাল্টে একেকরকম হয়েছে। ১৯৮৬ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের তালিকা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৮৩৩। অথচ বর্তমান সরকারের প্রথম দিকের একটি তালিকায় ২ লাখ ২ হাজার ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন – এই মর্মে আপত্তি দাখিল হয়েছে ৬২ হাজার। (তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল) সম্প্রতি খবর বেড়িয়েছে- প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচ সচিব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিয়ে চাকুরি করছেন। (তথ্যসূত্র : বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ১৬ এপ্রিল '১৮) এভাবে কোটার লোভে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে তালিকা ভরানো কেবল ভয়াবহ দুর্নীতির উদাহরণই নয়, আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চরম অপমানেরও।

আওয়ামী লীগ সরকার এই যন্ত্রণা ধারণ করার সামর্থ্য রাখে না। কেননা মুক্তিযুদ্ধও তাদের কাছে রাজনীতির কূটকৌশলের একটি হাতিয়ার। সব অপকর্মই তারা করে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র কথা বলে। আজ বাংলাদেশ খেলাপি ঋণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে, বিদেশে অর্থ পাচারে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে, সবচেয়ে কম মজুরিতে এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে, পরিবেশ সুরক্ষায় ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭৯ তম। এগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত হয় না। হয় কেবল কোটার ব্যাপার আসলে?

এমন অন্যায্য কোটা প্রথার বিরুদ্ধে লক্ষ শিক্ষার্থী রাস্তায় নামে। প্রথমে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ'র নামে কোটা আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমেই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের দাবির মুখে গত ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদের এক প্রশ্নোত্তর পর্বে কোটাব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। শিক্ষার্থীরা কোটা প্রথা সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা পুরোপুরি বাতিলের কথাই বলেছেন। তাঁর পুরো বক্তব্য ছিল স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। তিনি এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার – তাঁর এই ঘোষণার ফলে প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য স্বীকৃত যে অধিকার ছিল তাও সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। বর্তমানে দেশের বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোটা প্রথা পুরোপুরি বিলোপ সাধনের সুযোগ নেই। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে একটা যৌক্তিক সংস্কারের কথাই আন্দোলনকারী এবং বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন। কিন্তু তা না করে যদি কোটা পুরোপুরি তুলে নেয়া হয় তাহলে প্রকৃত অর্থেই যারা কোটা সুবিধা পাবার যোগ্য তাদের সাথে অন্যদের দ্বন্দ্বের সুযোগ তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এমন বিভ্রান্তিই ছড়িয়েছে।

কোটা আন্দোলন অনেক আকা-বাঁকা পথে এগিয়েছে। ছাত্রলীগ সারাদেশে আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও, হামলা-নির্যাতন করলেও পরে এসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর বিজয় মিছিলও করেছে। 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' নামের ব্যানারে কেন্দ্রীয় কমিটি আন্দোলনকে সঠিকখাতে পরিচালিত করতে পারেনি। ৯ এপ্রিল আন্দোলন যখন উত্যুঙ্গ অবস্থায়, তখন তারা সরকারের সাথে বৈঠক করে এক মাসের জন্য কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির এই নির্দেশনা বিপুল অংশের শিক্ষার্থীরা মেনে নেয়নি। তারা এরপরও আন্দোলন চালিয়ে গেলে এবং সারাদেশে একযোগে শিক্ষার্থীরা নেমে গেলে কেন্দ্রীয় কমিটি তার আগের অবস্থানে থাকতে পারেনি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ কোটা বাতিলের অযৌক্তিক ঘোষণা দেবার পরও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'মাদার অব এডুকেশন' আখ্যা দিয়ে আন্দোলন শেষ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্বের একটি অংশের মধ্যে শুরু থেকেই সরকারকে খুশি করে দাবি আদায় করার প্রবণতা দেখা গেছে। ব্যানারে, স্লোগানে ছিল তারই ছাপ। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। সরকারের নির্মম দমন-পীড়ন ঠিকই আন্দোলনকারীদের উপর নেমে এসেছে। মাঠের লড়াইয়ে থেকে অনেকেই তখন সরকারের প্রকৃত স্বরূপটি বুঝতে পেরেছে। একপর্যায়ে আন্দোলন তাই সরকার বিরোধিতার দিকেই ধাবিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদের দাঁড়ানো, মতিয়া চৌধুরীসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জোড়ালো প্রতিবাদের মধ্যে এই পরিবর্তন বোঝা যায়।

৫৬ শতাংশ কোটা থাকা যেমন অন্যায্য তেমনি সম্পূর্ণরূপে কোটা ব্যবস্থা তুলে দেয়াও অসঙ্গত। এটাই করেছে দেশের সরকার। তবে একটা কথা সবসময় মনে রাখা দরকার, সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাসহ জনগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোনো সরকারই করতে পারবে না। কারণ যে ব্যবস্থা দেশে চলছে সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় শিল্প-কলকারখানার সংখ্যা, উৎপাদনের সীমা। সকল মানুষের মধ্যে সুযোগের সমতা এখানে বিবেচিত হয় না। তাই কোথা প্রথা বাতিল কিংবা সংস্কার কোনোটি করেই দেশের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ এই ব্যবস্থায় করা সম্ভব হবে না। তাইতো দেশে একদিকে বিপুল প্রবৃদ্ধির গল্প শোনা গেলেও ৮০ হাজার বেকার প্রতিবছর নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের তকমা গায়ে লাগলেও ৪৭ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত যুবক থেকে যাচ্ছে বেকার। প্রতিনিয়ত বাড়ছে কোটিপতি আর গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। এই ব্যবস্থাটার নাম পুঁজিবাদ। একে পাল্টে সবক্ষেত্রে উৎপাদনের সামাজিক মালিকানার পত্তন আজকের দিনে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একমাত্র পথ।

কোটা আন্দোলন একটা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলল। সেই অর্থে এটি একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলন করতে গিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী কিছুটা হলেও চিনেছে রাষ্ট্রের স্বরূপ, দেখেছে শাসকের নিপীড়ন। একইভাবে উপলব্ধি করেছে যৌথভাবে লড়াইয়ের শক্তি। এই আন্দোলনেই উন্মোচিত হয়েছে শাসকের অনুগত তথাকথিত সুশীল সমাজ, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ধামাধরা শিক্ষকসমাজ, মাথা বিক্রি করা বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ। এই আন্দোলনের তাই অনেক অর্জন। নানা দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যে তারুণ্য আজ সংস্কারের জন্য দাবি তুলছে, তারাই হয়তো একদিন সবকিছু নিয়ে দাঁড়াবে ব্যবস্থাটিরই আমূল পরিবর্তনের জন্য। সেই দিনের জন্যই এদেশের নিপীড়িত জনগণ, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যত অপেক্ষা। সেই ক্ষণ যত এগুবে, ততই ছাত্র-জনতার মুক্তির পথ ক্রমেই পরিস্ফুট হতে থাকবে।

# মার্কস স্মরণে

## পল লাফার্গ

*[এ বছর সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের পথপ্রদর্শক মহান কার্ল মার্কসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বছরব্যাপী মার্কসের জীবন সংগ্রাম ও তাঁর অবদান নিয়ে সাম্যবাদে ধারাবাহিক লেখা ছাপানোর অংশ হিসেবে এবারের সংখ্যায় পল লাফার্গের ভাষ্যে কার্ল মার্কসের জীবনযাপনের কিছু দিক তুলে ধরা হলো। ব্যক্তিজীবনে কার্ল মার্কস মানুষটি কেমন ছিলেন, কী তিনি ভালোবাসতেন, প্রতিদিনের জীবনযাপনে কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন – তা-ই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন লাফার্গ। পল লাফার্গ (১৮৪২-১৯১১) ছিলেন ফ্রান্সের এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য এবং মার্কসের কন্যা লারা মার্কসের স্বামী। লেখাটির শেষ কিস্তি ছাপানো হলো]*

কাজ করাটা ছিল মার্কসের নেশা। কাজে এমন ডুবে থাকতেন যে প্রায়ই খেতে পর্যন্ত ভুলে যেতেন। প্রায়ই বেশ কয়েক বার ডাকাডাকির পর তবে তিনি খাবার ঘরে নেমে আসতেন আর শেষ গ্রাস মুখে তোলা সাঙ্গ হতে না-হতেই ফের ফিরে যেতেন পড়ার ঘরে। মার্কস ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পাহারী, এমন কি ক্ষুধামান্দ্যেও ভুগতেন। ক্ষুধামান্দ্য কাটানোর চেষ্টায় ধোঁয়ায়-জারানো মাছ, কেভিয়ার, আচার ইত্যাদি উগ্র গন্ধওয়ালা খাবার খেতেন। মস্তিষ্কের প্রবল সক্রিয়তার কারণে ভুগতে হোত তাঁর পাকস্থলীকে।

জীবনযাপনের এই অস্বাভাবিক ধরন এবং ক্লান্তিকর মননক্রিয়ার ধকল সামলাতে তাঁর শারীরিক গঠনকে রীতিমতো জোরদার হতে হয়েছিল। বস্তুত তাঁর শারীরিক গঠন ছিল শক্তিশালী। তিনি ছিলেন গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি লম্বা, কাঁধ দুটো ছিল বেশ চওড়া, বুকটা সুগঠিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস্য-যদিও ইহুদিদের ক্ষেত্রে প্রায়ই যেমন দেখা যায় তেমনই পা দুটোর চেয়ে তুলনায় তাঁর মেরুদণ্ড ছিল কিছুটা বেশি লম্বা। অল্পবয়সে যদি ব্যায়ামচর্চা অভ্যাস করতেন মার্কস তাহলে রীতিমতো শক্তিমান পুরুষ হয়ে উঠতে পারতেন। একমাত্র যে শারীরিক ব্যায়াম নিয়মিতভাবে সারা জীবন চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তা হল পায়ে হাঁটা। অনবরত কথা বলতে বলতে আর চুরুট টানতে টানতে ঘন্টার-পর-ঘন্টা হাঁটতে কিংবা টিলার চড়াই ভাঙতে পারতেন তিনি, অথচ বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হতেন না। বলা যেতে পারে, এমনকি ঘরের মধ্যেও হাঁটতে হাঁটতে কাজ করতেন মার্কস আর হাঁটার সময়ে যা ভাবতেন তা লিখে ফেলার জন্য মাঝে-মাঝে অল্প একটুক্ষণ বসতেন। কথা বলার সময়েও তিনি পায়চারি করতে ভালোবাসতেন, কেবল ব্যাখ্যাটা যখন বেশি প্রাণবন্ত কিংবা কথাবার্তা গুরুগম্ভীর হয়ে উঠত তখন থেকে-থেকে দাঁড়িয়ে পড়তেন।

বহু বছর ধরে হ্যাম্পস্টেড হীতে আমি ছিলুম তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণের সঙ্গী। ওই সময়ে মাঠে মাঠে তাঁর পাশাপাশি পায়চারি করার ফাঁকে ফাঁকে অর্থশাস্ত্রে আমার হাতেখড়ি হয়। 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ড লেখার সময়ে এইভাবে গোটা খণ্ডটির যাবতীয় বিষয়বস্তু আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝান। তিনি যে লেখার পরিকল্পনা আগে থেকে ফাঁস করে দিচ্ছেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর।

বাড়ি ফেরার পর সর্বদাই যা শুনেছি তা আমার সাধ্যমতো লিখে রাখতাম তখন। মার্কসের গভীর ও জটিল যুক্তিধারা অনুসরণ করা প্রথম প্রথম আমার পক্ষে কঠিন হোত। দুঃখের বিষয় ওই মূল্যবান লেখাগুলো পরে আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়, কারণ প্যারিস কমিউনের পর প্যারিসে ও বোর্দোয় আমার যাবতীয় কাগজপত্র পুলিশ তছনছ করে দেয়।

ওই সময়ে এক সন্ধ্যায় মার্কস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বহুবিধ প্রমাণ ও বহুমুখ বিবেচনার ফোয়ারা ছুটিয়ে মানব সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তাঁর চমৎকার তত্ত্বটির যে ব্যাখ্যা দেন, সে সম্পর্কিত আমার নেওয়া নোটগুলোও গেছে হারিয়ে। আজ এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। সেদিন মনে হয়েছিল যেন আমার দিব্যচোখ খুলে গেল। বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশের অন্তর্নিহিত যুক্তিসঙ্গতি সে-ই প্রথম স্বচ্ছভাবে চোখে পড়ল আমার এবং সমাজ ও মতাদর্শের বিকাশের সঙ্গে তাদের বৈষয়িক উৎসের সম্পর্কের মতো অমন একটা আপাত-বিরোধী ব্যাপার ধরা পড়ল আমার কাছে। যেন একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। এই অনুভূতি বহু বছর পর্যন্ত আমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে ছিল।

...এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে 'পুঁজি' বইটি আমাদের কাছে এমন একটি মনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেয় যে-মন আশ্চর্য প্রাণশক্তি ও উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু আমার কাছে এবং মার্কসকে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জানতেন তাঁরা সকলের কাছেই, কি 'পুঁজি' বইটি, কি অন্য কোনও রচনা কোথাও তাঁর প্রতিভার বিরাটত্ব কিংবা তাঁর জ্ঞানের বহুবিস্তৃত পরিধি পুরোপুরি প্রতিফলিত নয় বলেই মনে হয়। নিজের সৃষ্টির চেয়েও তিনি ছিলেন বহুগুণে উন্নততর, মহত্তর।

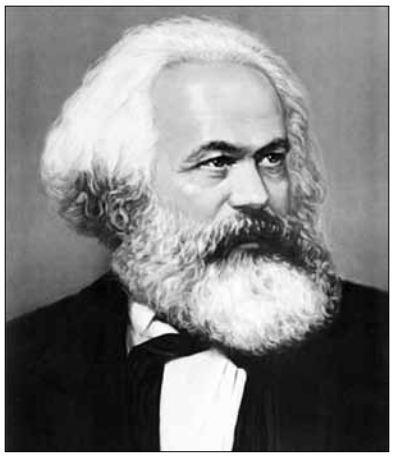

...নিজের সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে মার্কস ছিলেন সর্বদাই পরম বিবেকী; সব সেরা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যা সমর্থিত ছিল না এমন একটিও তথ্য বা সংখ্যা তিনি কখনও সংকলিত করতেন না। হাত ফেরতা পরোক্ষ তথ্যে কখনও সন্তুষ্ট থাকতেন না তিনি, সর্বদাই তার উৎসের সন্ধান করতেন, তা সে-প্রক্রিয়া যতই ক্লান্তিকর হোক না কেন। গৌণ কোনও তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সোজা ব্রিটিশ মিউজিয়মে চলে গিয়ে বই ঘাঁটতে পর্যন্ত কসুর করতেন না। ফলে তাঁর সমালোচকরাও কখনও প্রমাণ করতে পারেননি যে লেখার ব্যাপারে তাঁর যত্নের অভাব ছিল কিংবা এমন সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন কড়া পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যা অপারগ।

সব সময়ে একেবারে উৎসে পৌঁছানো পর্যন্ত না-ছাড়ার অভ্যাসের ফলে তাঁকে যেমন সব লেখকের রচনা পড়তে হত যাঁরা ছিলেন নিতান্তই স্বল্পপরিচিত এবং তিনিই ছিলেন একমাত্র যিনি ওই সব লেখকদের রচনা উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করেছিলেন। 'পুঁজি' বইটিতে স্বল্পপরিচিত লেখকদের রচনা থেকে এত বেশি সংখ্যায় উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ আছে যে মনে হতে পারে বইটিতে মার্কস বুঝি দেখাতে চেয়েছেন তাঁর পড়াশোনা কত বহুব্যাপক। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই তা ছিল না। মার্কস বলতেন, 'ঐতিহাসিক দিক থেকে ন্যায়বিচার করতে চেয়েছি আমি। যার যা প্রাপ্য তা-ই তাঁকে দিয়েছি'। তিনি মনে করতেন, যে লেখক সর্বপ্রথম সবচেয়ে সঠিকভাবে কোনও একটি ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন কিংবা সূত্রবদ্ধ করতে পেরেছেন তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দায়বদ্ধ, তা সে-লেখক যতই তুচ্ছ ও স্বল্পপরিচিত হোন না কেন তাতে কিছু যায়-আসে না।

সাহিত্যগত বা রচনা পদ্ধতির দিক থেকে যতখানি বিবেকবান ছিলেন মার্কস ঠিক ততখানিই ছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেও। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত লেখার ক্ষেত্রে তিনি যে কোনও তথ্যের উপর নির্ভর করতেন না তা-ই শুধু নয়, আদ্যন্ত পড়াশুনো না করে কোনও বিষয় নিয়ে মৌখিক আলোচনা করতেও ছিলেন নারাজ। বারবার সংশোধন করতে করতে যতক্ষণ না তিনি লেখার সবচেয়ে উপযুক্ত ধরনটি পেয়ে গেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও একটি রচনাও প্রকাশ করেন নি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রস্তুত না হয়ে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ তাঁর কাছে অসহনীয় ঠেকত। শেষবারের মতো কাটাকাটি করে লেখাটা মনোমতো না হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি কাউকে দেখানো তাঁর পক্ষে ছিল যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাব এত অনমনীয় ছিল যে কথায় কথায় একদিন আমাকে তিনি বলেছিলেন পাণ্ডুলিপিগগুলো বরং পুড়িয়ে ফেলবেন তা-ও ভালো, তবু তা অসম্পূর্ণ রেখে যাবেন না।

মার্কসের কাজ করার এই ধরন তাঁর উপর এমন গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করত যে পাঠক তার ব্যাপ্তি কল্পনা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'পুঁজি'-তে ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি-আইন সম্বন্ধে পাতা বিশেকের মতো লেখার জন্যে তিনি ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন কমিশনের ও ফ্যাক্টরি-ইনস্পেক্টরদের লেখা কার্যবিবরণী সমন্বিত এক-লাইব্রেরি ব্লু বুকই পড়ে শেষ করেছিলেন। রিপোর্টগুলিতে মার্কসের দেওয়া পেন্সিলের দাগ দেখে বোঝা যায় সেগুলি আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন তিনি। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অনুধাবনে ওই রিপোর্টগুলিকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিবেচনার প্রসূত দলিল হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

আলোচ্য 'ব্লু' বুক'গুলো থেকে বাস্তব তথ্যভিত্তিক সংবাদের রীতিমতো এক সম্ভার আহরণ করেছেন মার্কস। ওই বইগুলো যাঁদের মধ্যে বিলি করা হয় পার্লামেন্টের সেই সদস্যদের অনেকেই ওগুলোকে একমাত্র চাঁদমারির নিশানা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, বইগুলিতে যে-কখানা পাতা ফুটো হয়, তাই দিয়ে পিস্তলের শক্তির বিচার করেন তাঁরা। অন্যের বইগুলো বিক্রি করে দেন ওজন দরে। ওগুলো নিয়ে অন্য কিছু করার চেয়ে এ কাজ অবশ্য খুবই যুক্তসঙ্গত, কারণ ওরই ফলে পুরনো কাগজ বিক্রি ওয়ালাদের কাছ থেকে সস্তা দরে বইগুলো কিনতে পেরেছিলেন মার্কস। পুরনো বই ও কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে ওই কাগজ বিক্রি ওয়ালাদের দোকানে মার্কস প্রায়ই যেতেন। অধ্যাপক বীজলি বলেছেন, মার্কসই ছিলেন সেই লোক যিনি ইংল্যান্ডের সরকারি তদন্তের রিপোর্টগুলি সকলের চেয়ে বেশি করে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সেগুলো সেই প্রথম বিশ্বেও গোচরে এনেছিলেন। অধ্যাপক অবশ্য জানতেন না যে ১৮৪৫ সালের আগেই ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে বই লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস ওই সব 'ব্লু' বুক' থেকে বহুবিধ দলিল সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

...পিতা হিসাবে মার্কস ছিলেন স্নেহপ্রবণ, মৃদুস্বভাব ও সন্তানদের প্রশ্রয়দাতা। তিনি বলতেন, 'বাপ-মাকে শিক্ষা দেবে ছেলেপিলেরাই।' মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতৃত্বপরায়ণ পিতৃত্ববোধের চিহ্নমাত্র ছিল না, তাঁর প্রতি মেয়েদের ভালোবাসাও ছিল অসামান্য। মেয়েদের কখনও হুকুম করতেন না তিনি, বরং যখন যা তাঁর দরকার হোত তখন তাঁদের কাছে এমনভাবে চাইতেন যে মনে হোত তিনি যেন তাঁদের আনুকূল্যের প্রার্থী; কিংবা মেয়েদের যে-কাজ তাঁর কাম্য ছিল না তাও এমনভাবে জানিয়ে দিতেন যে কাজটা করতে যে নিষেধ করা হচ্ছে সেটা মোটেই হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়ে দিতেন না তাঁদের। অথচ তাঁর মেয়েদের মতো অত বশ্য বাধ্য সন্তান কোনও পিতার ছিল কিনা সন্দেহ। মেয়েরা তাঁকে গণ্য করতেন বন্ধু হিসেবে, আচরণ করতেন তাঁর সঙ্গে সমকক্ষ সঙ্গীর মতো। তাঁরা ওঁকে 'বাবা' বলে ডাকতেন না, রসিকতা করে বলতেন 'মুর' – গায়ের ময়লা রঙ ঘনকৃষ্ণ চুল আর দাড়ির জন্যে এই ডাকনাম পেয়েছিলেন তিনি। বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলোয় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন মার্কস। মস্ত একটা জলের গামলায় নৌযুদ্ধ আর কাগজের নৌবহরে আগুন লাগানোর কথা এখনও মনে আছে ওঁদের। কাগজের জাহাজগুলো মেয়েদের জন্য বানাতেন মার্কস আর সেগুলোয় আগুন দিয়ে ওদের প্রচুর আনন্দ দিতেন।

রবিবারগুলোয় মেয়েরা মার্কসকে কাজ করতে দিতেন না, সারা দিনের মতো সেদিনটায় তিনি থাকতেন ওঁদের দখলে। আবহাওয়া যদি ভালো থাকত পুরো পরিবার ওইদিন শহরতলিতে হাঁটতে যেতেন। যেতে যেতে পথের ধারের ছোটখাট কোনও সরাইখানায় থামতেন তাঁরা রুটি, পনির আর খানিকটা জিঞ্জার বিয়ার খেয়ে নিতে। মেয়েরা যখন ছোট ছিল, লম্বা পথকে তাঁদের কাছে সংক্ষেপ করে তুলতেন তিনি অসংখ্য আজগুবি গল্প শুনিয়ে। গল্পগুলো পথে যেতে যেতেই বানাতেন তিনি, যতখানি পথ যেতে হবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেনে লম্বা করতেন সেগুলোকে আর গল্পের জটিলতাগুলো ভরিয়ে তুলতেন বেশি বেশি উত্তেজনা দিয়ে যাতে গল্প শোনার আগ্রহে বাচ্চারা পথচলার ক্লান্তি ভুলে থাকতে পারে।

তাঁর ছিল তুলনাহীন উর্বর কল্পনাশক্তি। কবিতা ছিল তাঁর প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা। স্বামীর তরুণ বয়সের লেখা কবিতাগুলি সযত্নে রক্ষা করতেন শ্রীমতি মার্কস, কিন্তু কখনও কাউকে তা দেখাতেন না। মার্কসের পরিবার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি একজন সাহিত্যিক কিংবা অধ্যাপক হবেন, সমাজতান্ত্রিক প্রচার-আন্দোলন ও রাজনীতি সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রেও চর্চা করে তিনি নিজের অবমাননা করছেন এই ছিল তাঁদের ধারণা। এই শেষোক্ত বিষয়গুলির চর্চা তখন জার্মানিতে অশ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হোত।

....মার্কসের স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সারা জীবনের সহকর্মিণী। একেবারে শিশুকাল থেকে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন তাঁরা, বড় হয়েও উঠেছিলেন একসঙ্গে। প্রাকবিবাহ বাগদানের সময় মার্কসের বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। ১৮৪৩ সালে বিয়ে হবার আগে দীর্ঘ সাত বছর এই তরুণ দম্পতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিয়ের পর অবশ্য আর কখনও তাঁরা পরস্পরের কাছছাড়া হননি। স্বামীর মৃত্যুর অল্প কিছু আগে শ্রীমতী মার্কসের মৃত্যু হয়। যদিও এক জার্মান অভিজাত পরিবারের জাত ও লালিত হয়েছিলেন তিনি, তবু সাম্যের বোধ তাঁর চেয়ে আর কারও মধ্যে বেশি ছিল না। কোনওরকম সামাজিক বৈষম্য বা শ্রেণিগত ছুৎমার্গের অস্তিত্ব ছিল না তাঁর কাছে। দৈনন্দিন কাজের পোশাক-পরা শ্রমজীবী মানুষজনকে তাঁর বাড়িতে ও তাঁর খাবার টেবিলে এমনভাবে অভ্যর্থনা ও যত্নআত্তি করতেন তিনি যে মনে হোত তাঁরা বুঝি ডিউক কিংবা রাজপরিবারের লোকই। সকল দেশের বহু শ্রমিকই শ্রীমতি মার্কসের আতিথেয়তায় ধন্য হয়েছেন এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে একজনও স্বপ্নে ভাবতে পারেননি যে অমন স্বচ্ছন্দ ও আন্তরিক সহৃদয়তা নিয়ে যে-মহিলাটি তাঁদের গ্রহণ করেছিলেন, মাতৃকূলের দিক থেকে তিনি ছিলেন আর্গাইলের ডিউকদের বংশোদ্ভূতা এবং তাঁর ভাই ছিলেন প্রাশিয়ার রাজার একজন মন্ত্রী। তার জন্যে শ্রীমতী মার্কসের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কার্লের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন তিনি এবং কখনও, এমনকী প্রচণ্ড অভাবের সম্মুখীন হয়েও, এরজন্যে কোনওদিন অনুতাপ করেন নি।

...মার্কস পরিবারের অপর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন হেলেন ডেমুথ। চাষির ঘরে জন্ম হয়েছিল তাঁর। শ্রীমতী মার্কসের বিয়ের বহু আগে, যখন তিনি শৈশব অতিক্রম করেছেন কিনা সন্দেহ তখন থেকেই ডেমুথ তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত। তাঁর খুদে মনিবানী বড় হবার পর যখন তাঁর বিয়ে হল তখনও হেরেন তাঁর সঙ্গে রয়ে গেলেন এবং আত্মস্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মার্কস পরিবারের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত কররেন। তাঁর মনিবানী ও তাঁর স্বামী ইউরোপের যেখানে যেখানে গেছেন তিনিও তাঁদের সহযাত্রী হয়েছেন সেইখানেই আর অংশভাগ হয়েছেন তাঁদের নির্বাসিত জীবনের সকল দুঃখকষ্টের।

হেলেন ছিলেন সংসারটির ত্রাণকর্ত্রী, অত্যন্ত কঠিন অভাবের মধ্যেও উদ্ধারের একটা-না-একটা উপায় তিনি সব সময়েই খুঁজে পেতেন। একমাত্র তাঁর শৃঙ্খলাবোধ, মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার কারণেই মার্কস-পরিবার কোনওদিন অন্ততপক্ষে একেবারে মোটাদাগের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব বোধ করেননি। হেলেন করতে পারতেন না হেন কাজ ছিল না। রান্নাবান্না, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# ভারতের পানি আগ্রাসন এবং সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

সকল আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি লঙ্ঘন করে উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহার করে ভারত বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম নদী তিস্তাকে শুকিয়ে মারছে। গত ৬ বছর ৩ জেলার ১২ উপজেলার কৃষক ক্ষেতমজুর ও কৃষিজমি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও মাঝি পরিবার বেকার। কৃষক জনতার মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম হাহাকার।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব মতে, তিস্তা দিয়ে একসময় শুষ্ক মৌসুমে ১৪ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহিত হত। কিন্তু ভারত গজলডোবা ব্যারেজের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করার পর বাংলাদেশে এই পানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার কিউসেক। খড়া মৌসুমে তা ২৫০-৩০০ কিউসেকে নেমে আসে। বৃহত্তম রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারি ও বগুড়া জেলার সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯৯৩ সালে তিস্তা সেচ প্রকল্প চালু হয়। সেচ প্রকল্প চালু থাকলে চাষীরা ২০০-২৫০ টাকায় প্রতি বিঘা জমিতে পুরো মৌসুম জুড়ে পানি দিতে পারে। কিন্তু সেচ প্রকল্প বন্ধ থাকলে সেই জমিতে সেচ খরচ পড়ে ২০০০-২৫০০ টাকা। এছাড়া কৃত্রিমভাবে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে সেচ দেবার ফলে পানির স্তর বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে মরুকরণের সম্ভাবনার পাশাপাশি পানিতে আর্সেনিক বিষ মিশ্রিত হয়ে ব্যাপক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

আমাদের দেশের ১১৭ কিলোমিটার তিস্তা নদী শুকিয়ে গেছে। ভারত সরকার একতরফাভাবে তিস্তার পানি প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'জলপ্রবাহ কনভেনশন' এ পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে যুক্তি ও ন্যায়পরায়নতার নীতিমালা গ্রহণ করে। এর মূল কথা হলো উজানের কোনো দেশ ভাটির কোনো দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে একক সিদ্ধান্তে পানি আটকাতে পারে না। অথচ ভারত এই কাজটি করেছে। আইনে বলা আছে, ' কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের গৃহীত পানি নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' হেলসিংকি নীতিমালাতেও বলা আছে, প্রতিটি নদী তীরবর্তী রাষ্ট্র তার সীমানা, পানি সম্পদের ব্যবহার ভোগ করবে 'যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার' ভিত্তিতে। তাও তারা মানছে না। তারা আমাদের সাথে বৃহৎ রাষ্ট্রসুলভ আচরণ করছে, সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে। এই অবস্থা শুধু তিস্তার ক্ষেত্রেই নয়, ভারত থেকে আসা ৫৪টি নদীর পানি প্রবাহ তারা একইভাবে নিয়ন্ত্রণ কিংবা অন্যায়ভাবে প্রত্যাহার করছে।

এই অবস্থায় বাসদ (মার্কসবাদী) গত ৬ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের অংশ হিসাবে প্রচার মিছিল, সমাবেশ, রোড মার্চ, ঘেরাও কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। 'তিস্তা ও কৃষি বাঁচাও আন্দোলন' নামক গণকমিটির মাধ্যমে এই আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে। ভারতের পানি আগ্রাসন এবং সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের সামনে অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই।

# মন্টি চাকমা ও দয়াসোনা চাকমাকে উদ্ধার অপহরণকারী ও তাদের মদদদাতাদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মিছিল সমাবেশ

হিল উইমেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মন্টি চাকমা ও রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক দয়াসোনা চাকমাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার, অপহরণকারী ও তাদের মদদদাতাদের গ্রেফতার ও বিচার, পাহাড় ও সমতলে সংঘটিত সকল ধর্ষণ-গুম-খুন-অপহরণের বিচার, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অঘোষিত সেনাশাসন প্রত্যাহার এবং পাহাড় ও সমতলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে মশাল মিছিল, প্রতিবাদী নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

# মার্কস স্মরণে

*(৩য় পৃষ্ঠার পর)* বাচ্চাদের পোষাক পড়ানো, তাদের জামা কাঁটছাঁট করা ও সেসব সেলাইফোঁড়াই – শ্রীমতী মার্কসের সঙ্গে তিনি ছিলেন গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়িকা ও সংসারের বাজার-সরকার। বস্তুত, গোটা সংসারটা পরিচালনা করতেন তিনিই।

বাচ্চারা তাঁকে মায়ের মতো ভালোবাসত আর তাদের প্রতি হেলেনের মাতৃত্বের ভাব তাঁকে সত্যিকারের মায়ের অধিকার দিয়েছিল। শ্রীমতী মার্কস তাঁকে প্রাণের বন্ধু হিসেবে গণ্য করতেন। মার্কসদের সঙ্গে যারই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত তাকেই তিনি নিজের মাতৃত্বসুলভ রক্ষণাবেক্ষণের অধীন করে নিতেন। এক কথায় তিনি যেন সকলের, গোটা পরিবারের মা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মার্কস ও তার স্ত্রীর চেয়ে বেশিদিন বেঁচে ছিলেন হেলেন এবং স্থান পরিবর্তন করে এঙ্গেলসের সংসারে রক্ষণাবেক্ষণে অধিষ্ঠিত হন। বালিকা বয়স থেকেই এঙ্গেলসকে চিনতেন তিনি, তাই মার্কস পরিবারের প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্প্রসারিত হয়ে অবশেষে এঙ্গেলসকে আশ্রয় করে।

বলতে গেলে এঙ্গেলস ছিলেন মার্কস পরিবারেরই একজন। মার্কসের মেয়েরা তাঁকে পিতৃসম জ্ঞান করতেন। তিনি ছিলেন মার্কসের 'দ্বিতীয় সত্তা'। দীর্ঘদিন ধরে জার্মানিতে এই দুটি নাম কখনও পৃথকভঅবে উচ্চারিত হয়নি আর ইতিহাসে নাম দুটি চিরদিন সংযুক্ত থাকবে। প্রাচীন কালের কবিরা যে-সখ্যের আদর্শ চিত্রিত করে গেছেন আমাদের কালে মার্কস আর এঙ্গেলস ছিলেন সেই সখ্যের মূর্ত প্রতীক। তরুণ বয়স থেকে তাঁরা পরিণত হয়ে উঠেছিলেন একসঙ্গে এবং পরস্পরের সমান্তরালভাবে, মতাদর্শ ও মানস-অনুরাগের ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধনে যাপন করেছিলেন জীবন এবং একই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ছিলেন অংশ; যতদিন একসঙ্গে থাকতে পেয়েছিলেন, দু'জনে কাজ করেছিলেন যৌথ ভাবে। ঘটনাচক্রে প্রায় বিশ বছর যদি তাঁরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকতেন, তাহলে সম্ভবত সারা জীবনই একসঙ্গে কাজ করে যেতেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালের বিপ্লব পরাস্ত হওয়ার পর এঙ্গেলসকে চলে যেতে হয় ম্যাঞ্চেস্টারে আর লন্ডনে থেকে যেতে বাধ্য হন মার্কস।

তবু তা সত্ত্বেও, যৌথ মানসজীবন যাপন করে চলেন দুজনে প্রায় প্রতিদিন পরস্পরকে চিঠি লেখার মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানক্ষেত্রের ঘটনাবলী এবং পরস্পরের রচনা সম্পর্কে মতবিনিময়ের সূত্রে। বাধ্যতামূলক কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দৌড়ে চলে এলেন লন্ডনে, তাঁর প্রিয় মার্কসের বাসা থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথের ব্যবধানে বাসা নিলেন। তারপর ১৮৭০ থেকে বন্ধুর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন এই দুটি মানুষ কখনও এঁর কখনও-বা ওঁর বাড়িতে পরস্পর মিলিত হননি।

এঙ্গেলস যেদিন মার্কসদের জানালেন যে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে পাঠ উঠিয়ে চলে আসছেন, সেটি ছিল মার্কস-পরিবারের উৎসবের দিন। তখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত তাঁর আগমন নিয়ে পরিবারের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল বহুদিন আগে থেকেই, আর যেদিন সত্যিসত্যিই আসার দিন এল মার্কস সেদিন এত অস্থির হয়ে রইলেন যে সারাদিন কাজই করতে পারলেন না। দুই বন্ধু সেদিন সারারাত্রি ধূমপান সহযোগে তাঁদের শেষ দেখাসাক্ষাতের পর যা-যা ঘটেছিল সে সমস্তের আলোচনা করে কাটালেন।

অন্য যেকোনও লোকের থেকে এঙ্গেলসের মতামতকে বেশি মূল্য দিতেন মার্কস, কারণ তিনি মনে করতেন এঙ্গেলসই হলেন সে-ই লোক যিনি তাঁর সহযোগী হবার যথার্থ উপযুক্ত। তাঁর কাছে এঙ্গেলস ছিলেন পুরো একটি সভার শ্রোতৃমণ্ডলীর সমতুল্য। যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করে এঙ্গেলসকে বুঝিয়ে স্বমতে আনার উদ্দেশ্যে কোনও প্রয়াসই মার্কসের কাছে অতিরিক্ত বেশি বলে গণ্য হোত না। যেমন, একটা উদাহরণ দিই। আলবিগোয়নের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় যুদ্ধ* সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার সময়ে আমার ঠিক মনে নেই কোনও একটা গৌণ বিষয়ে এঙ্গেলসের মতের পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা তথ্যের সন্ধানে মার্কসকে আমি কয়েকখানা গোটা বই বারেবারে ফিরে ফিরে পড়তে দেখেছি। মত পরিবর্তন করিয়ে এঙ্গেলসকে স্বমতে আনাটা মার্কসের পক্ষে মস্ত একটা কৃতার্থতার আনন্দের ব্যাপার ছিল।

...এঙ্গেলসের জ্ঞানের বহুমুখিতার প্রশংসা করতেন মার্কস, পাছে এঙ্গেলসের সামান্যতম কোনও বিপদ ঘটে এই ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকতেন। এ-প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলেছিলেন, 'শিকারে গিয়ে কোনও বিপদ আপদ ঘটে এই ভয়ে সর্বদাই কাঁপি আমি। এত দুরন্ত স্বভাব ওর মাঠঘাটের ওপর দিয়ে রাশ আলগা করে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে, কোনওরকম বাধার পরোয়া করে না'। যতখানি স্নেহপ্রবণ স্বামী ও পিতা ছিলেন মার্কস ঠিক ততখানিই ছিলেন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। তিনি যে-স্তরের মানুষ ছিলেন তার উপযুক্ত ভালোবাসার পাত্রপাত্রীও খুঁজে পেয়েছিলেন স্ত্রী ও মেয়েদের মধ্যে, হেলেন আর এঙ্গেলসের মধ্যে।

র‍্যাডিকাল বুর্জোয়ার নেতা হিসাবে সমাজ-জীবন শুরু করেছিলেন মার্কস। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তিনি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত, আর যেই কমিউনিস্ট হয়ে দাঁড়ালেন অমনি আগের মিত্ররা সকলেই তাঁর শত্রু হয়ে উঠলেন। তুমুল নিন্দাবাদ ও মিথ্যা কুৎসা রটনার পর নির্যাতিন করে জার্মানি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল, তারপর তাঁর ও তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিরুদ্ধে শুরু হল একেবারে চুপচাপ থাকার একটা ষড়যন্ত্র। মার্কস যে ১৮৪৮ সালের ২ ডিসেম্বরের ক্যুদেতার কারণ ও ফলাফলগুলির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন ও তা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন – এই সত্যটি যাতে প্রমাণিত হয়েছে সেই 'আঠারোই ব্রুমেয়ার' বইটিকে চুপচাপ থেকে বেমালুম উপেক্ষা করা হল। সৃষ্টিকর্মটির জলজ্যান্ত অস্তিত্ব সত্ত্বেও একটিও বুর্জোয়া সংবাদপত্র তার উল্লেখ পর্যন্ত করল না।

অতঃপর মার্কসকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। আন্তর্জাতিক ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল আর তার কীর্তির গরিমায় পূর্ণ করে তুলল জগতকে। যদিও মার্কস নিজে নেপথ্যে থেকে সংগঠনে অন্যদের কাজ করতে দিতেন তবু পশ্চাদভূমির সেই আসল লোকটি যে কে তা শিগগিরিই ধরা পড়ে গেল।

জার্মানিতে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হল এবং তা রীতিমতো এক শক্তিতে পরিণত হল, যাকে আক্রমণ করার আগে বিসমার্ক** তার প্রণয়প্রার্থনা করলেন পর্যন্ত। লাসালের*** জনৈক অনুরাগী শুভাইটসার 'পুঁজি' বইটিকে শ্রমজীবী জনসাধারণের গোচর করার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। অতঃপর, ইয়োহান ফিলিপ বেকারের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস থেকে গৃহীত এক নির্দেশনায় 'শ্রমিক শ্রেণির বাইবেল' এই আখ্যা দিয়ে 'পুঁজি' গ্রন্থটির প্রতি

বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ এবং প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি। 'পুঁজি' হয়ে দাঁড়াল সকল দেশের সমাজতন্ত্রীদের সার গ্রন্থ। সকল সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক শ্রেণির সংবাদপত্রে ওই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ প্রচারিত হতে লাগল। ওই সময়ে নিউ ইয়র্কে একটা মস্ত বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধর্মঘটের সময় 'পুঁজি' বইটি থেকে নানা অংশবিশেষ শ্রমিকদের সহনশীলতা বাড়িয়ে তোলার ও তাঁদের দাবিদাওয়া যে কত ন্যায্য তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রচারপত্রের আকারে ছেপে প্রকাশ করা হয়।

প্রায় সব প্রধান-প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় 'পুঁজি' বইটি অনূদিত হল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধবাদীরা যতবার চেষ্টা করেছে এ বইয়ের তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করতে ততবারই সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিসম্মত জবাব পেয়ে তাদের মুখ গেছে বন্ধ হয়ে। আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস থেকে একদা যেমনটি বলা হয়েছিল 'পুঁজি' আজ সত্যিই তাই, অর্থাৎ 'শ্রমিক শ্রেণির বাইবেল' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

...যে অসুখে জেনি মার্কসের মৃত্যু ঘটে সেই অসুখ তাঁর স্বামীর জীবনেও ছেদ টানে। স্ত্রীর দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগের সময়ে রাত্রি জাগরণজনিত শ্রান্তিতে, ব্যায়াম ও মুক্ত বাতাসের অভাবে এবং মানসিক দিক থেকে জীর্ণ হয়ে গিয়ে মার্কসও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। সেই অসুখই কাল হল তাঁর।

১৮৮১ সালে ২ ডিসেম্বর শ্রীমতী মার্কস প্রয়াত হলেন। যেমন সারা জীবন তেমনই মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তিনি রয়ে গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট ও বস্তুবাদী। মৃত্যুতে ভয় ছিল না তাঁর। যখন অনুভব করলেন যে তাঁর অন্তিম কাল উপস্থিত তখন শুধু বলেছিলেন, 'কার্ল, আমার শক্তি ফুরিয়ে আসছে।'

এই কথাগুলিই ছিল তাঁর শেষ সুবোধ্য উক্তি। ৫ ডিসেম্বর তারিখে হাইগেট সমাধিক্ষেত্রের মন্ত্রপূত না-করা জায়গায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ও মার্কসের জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রীমতী মার্কসের অন্ত্যেষ্টির দিনটিকে সর্বসাধারণের গোচর করা হয়নি এবং কেবলমাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই তাঁর এই শেষযাত্রায় শবানুগমন করেন। মার্কসের পুরনো বন্ধু এঙ্গেলস শ্রীমতী মার্কসের সমাধিপার্শ্বে অন্ত্যেষ্টিভাষণ দেন।...

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মার্কসের জীবন হয়ে দাঁড়ায় একের-পর-এক শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগের এক অনুক্রম। সে-সবই বরণ করে নিচ্ছিলেন তিনি অপরিসীম বীরোচিত সহনশীলতার সঙ্গে। কিন্তু এর একবছর পর জেষ্ঠ্যা কন্যা শ্রীমতী লোঙ্গের আকস্মিক মৃত্যুতে যন্ত্রণার এই আগুন দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এবার একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি, আর সামলে উঠতে পারলেন না।

১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ তারিখে কর্মরত অবস্থায় মহাপ্রয়াণ ঘটল মার্কসের।

**আলবিগোয়নের যুদ্ধ (১২০৯-১২২৯) - পোপের সঙ্গে মিলে উত্তর ফ্রান্সের সামন্তবর্গ দক্ষিণ ফ্রান্সের তথাকথিত 'বিধর্মী'-দের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালায়, দক্ষিণ ফ্রান্সের ' আলবিগোয়নের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ফ্রান্সের আল্‌বিনগরের কারিগর ও ব্যাপারীদের স্বাধিকার বজায় রাখার সংগ্রাম প্রথাসিদ্ধ দক্ষিণ রোমান ক্যাথলিক সংস্কার বা যাজক পদসমূহের ক্রমিক শ্রেণীবিন্যাসের রীতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিরোধ ও সংঘর্ষের রূপ নিয়ে এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়।*

***অটো বিসমার্ক (১৮২৫-১৮৬৪) প্রাশিয়ান রাষ্ট্রনায়ক; ১৮৭১ সাল থেকে জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর।*

****ফার্ডিনানড লাসাল (১৮২৫-১৮৬৪) জার্মান পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী। ১৮৬৩ সালে ইনি নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস লাসালাবাদের সিদ্ধান্তসমূহ, কর্মনীতি ও সাংগঠনিক রীতিপদ্ধতিকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে ও সোস্যাল ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ আখ্যা দিয়ে বারবার তার কড়া সমালোচনা করেন।*

# নির্বাচন জনগণকে মুক্তি দিতে পারে না

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)* প্রায় সবাই মনে করেন। কিন্তু ২০১৪ সালের মতো আরেকটা নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় যাবে এবং প্রতিবাদহীনভাবে সেটা সম্পন্ন হবে– অনেকেই সেরকম মনে করছেন না, বিশেষত: মানুষের এই ভীষণ ক্ষুব্ধতা দেখে। আবার দেশের মানুষ নেতৃত্বহীন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কিছু একটা ঘটিয়ে দেবে তা-ও হতে পারে না। বিএনপি ও তার জোট দেশের সমস্যা-সংকট নিয়ে কোনোদিন কোনো লড়াই করেনি। তারা ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ যা করছে তাই করতো। এদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই।

বামপন্থী দলগুলোর দু'একটি বাদে বাকিরা সবাই নির্বাচনমুখী। তাহলে জনগণের এই বিক্ষোভকে সংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তর করবে ও তাকে নেতৃত্ব দেবে কে? এই অবস্থায় বিতর্ক এখন আর আন্দোলন কীভাবে হবে এই জায়গায় নেই, বরং নির্বাচন কীভাবে হবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। আরও স্পষ্ট করে বললে বিতর্ক এখন এটাই যে, আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগ কীভাবে পরিচালনা করবে এবং সেটাকে বিএনপি ও তার জোট কীভাবে মোকাবেলা করবে। বামপন্থী দলগুলোর বেশিরভাগটাই এখন এটাই আলোচনা করছেন এবং এই দুইয়ের লড়ালড়ির মধ্য থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা তার হিসাব করায় ব্যস্ত আছেন।

এটা সুখকর কোনো বিতর্ক নয়। এই বিতর্কে জনগণের কোনো ভূমিকা নেই। এতবার নির্বাচন করে, নির্বাচনের জন্য লড়াই করে, প্রাণ দিয়েও আমরা দেখেছি যে, তুলনামূলক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসে সে আমাদের কী দেয়, কী দিতে পারে। দেশে যদি পাঁচ বছর পরপর তথাকথিত তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বিঘ্নে সংগঠিত হয়, কোন সমস্যা না হয়– তাহলেও কি আমাদের ভাগ্য ফিরবে?

### ব্যবস্থা বজায় রেখে নির্বাচন কোনদিনই মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না

বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ কী অবস্থানে আছে তা এ সময়ে পত্রপত্রিকায় উঠে এসেছে। শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ, নিম্নতম মজুরি, যৌন সহিংসতা, বিদেশে অর্থ পাচার, খেলাপি ঋণ, বাল্য বিবাহ, দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এরকম বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয়। অপরদিকে পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ সুরক্ষা, আইনের শাসন এসব দিকে এর অবস্থান সবচেয়ে নিচে। অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পরিচালিত দেশগুলোর মধ্যেও সবেচেয়ে নিম্নস্থানে তার অবস্থান। গণতন্ত্রের কী দেয়া উচিত একটা রাষ্ট্রকে, তার রূপ কী – সেটা বোঝার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চেতনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান কোনোটাই এদেশের বেশিরভাগ নাগরিকের নেই। কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ছুটছে দেশের বেশিরভাগ মানুষ, সেটাও জুটছে না তার।

তীব্র শোষণে নিষ্পেষিত মানুষকে ভাষা যোগান দেশের শিক্ষিত মানুষেরা, লেখক-বুদ্ধিজীবীরা। সংবাদপত্র অন্যায় ও শোষণের কথা তুলে নিয়ে আসে। গণতন্ত্রে এই মাধ্যমগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশে প্রতিদিনই মত প্রকাশের সমস্ত স্বাধীনতা একে একে ছেঁটে ফেলা ও মত প্রকাশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সংকুচিত করার চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে কেটেছেঁটে যতটুকু মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যতটুকু সভাসমিতি করার অধিকার, বক্তব্য দেয়া ও প্রকাশ করার অধিকার ছিল তা আরও সংকুচিত করা হয়েছে এবং ক্রমাগত করা হচ্ছে। 'তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০১৬' এর ৫৭ ধারার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনানুষ্ঠানিক, নিতান্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো শুরু হলো। এ নিয়ে হইচই পড়ে গেলে একে সংশোধন করে যে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৭' করা হলো, তাতে বাস্তবে ৫৭ ধারাকে প্রতিস্থাপিতই করা হলো! আওয়ামী লীগ বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিপরীতে যাতে কিছু লেখা না হয় সেজন্য 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬' এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মতো এ জাতির জীবনের এতবড় একটা ঘটনা নিয়ে কেউ কিছু লিখতে পারবে না, গবেষণা করেতে পারবে না, পুরানো তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না, শুধু আওয়ামী লীগের দেয়া বই পড়বে– একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তির কবর খননের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না।

এখন ঢাকা শহরে ঘরোয়া সভা করতে গেলেও পুলিশের সম্মতির প্রয়োজন হয়। পুলিশ সরাসরি কোনো ঘোষণা দেয়নি, কিন্তু পুলিশকে 'অবগতকরণ পত্র' দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত না হয়ে কেউ হল ভাড়া দেন না। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়াম বরাদ্দের ক্ষেত্রে অঘোষিত নিয়ম জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক প্রতিষ্ঠানের তদারকিতে থাকা হলগুলোর ভাড়া বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে চার-পাঁচগুণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল স্থাপনা আবেদন করে বরাদ্দ নেয়া যেত সেগুলো এখন ভাড়া দেয়া হয়। প্রতিবাদ সমাবেশকে নিরুৎসাহিত করা হয়, উৎসাহিত করা হয় বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ভোগ্যপণ্যের প্রচারমূলক অনুষ্ঠানকে।

অডিটোরিয়াম, হল ও স্থাপনা বরাদ্দের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, দীর্ঘদিন ধরে যেসব অনুষ্ঠান দেশের সাধারণ মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় – সবকিছুর উপরই নিষেধাজ্ঞার খড়্গ তুলে দেয়া হয়েছে। পয়লা বৈশাখের আগে একগাদা নির্দেশনা জারি করা হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে একটা কথাই বলা হচ্ছে 'জাতীয় নিরাপত্তা'। পয়লা বৈশাখে বিকেল ৫টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছেড়ে দিতে হবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে, বইমেলা, ঈদ, পূজাসহ সকল অনুষ্ঠান সীমাহীন নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত, কারণ জাতীয় নিরাপত্তা। অথচ এ জাতি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কাছেই সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ, দেশে প্রতিমাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায় গড়ে ৭ জন করে লোক।

সভা-সমিতি ও রাজনৈতিক দল করার অধিকারও এখন ভীষণ মাত্রায় সংকুচিত। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ স্বাধীনভাবে সভা, সমিতি ও রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। নির্বাচনে বাধাহীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটাই গণতান্ত্রিক দেশের রীতি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর সে পরিবেশ নেই। নিবন্ধনের বিধান করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকে সীমিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে। আজ সেই অর্থনীতি একচেটিয়া হয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতাকেই সংকুচিত করে কখনও দুই দলের, কখনও একদলের শাসনব্যবস্থায় পরিণত করেছে। নির্বাচন কমিশন থেকে দেয়া শর্তগুলো পূরণ করে নতুন কোনো দলের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা খুব কঠিন। তাকে হয় ভুল তথ্য দিতে হবে, নতুবা সরকারের অনুগত হয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। এ ভিন্ন তার নিবন্ধনের তথা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো উপায় নেই। গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সীমাকে ক্রমাগত ছোট করে ফেলা হচ্ছে। সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণ, সীমাবদ্ধ আলোচনা, সীমাবদ্ধ মত– এখন এ নিয়েই বুর্জোয়া রাষ্ট্র। অথচ মতামতের বৈচিত্র্য ও তর্ক-বিতর্ক – এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল।

ফলে গণতন্ত্রের শর্তগুলোর কোনোটিই আজ দেশে বিরাজ করে না। এ অবস্থা বজায় রেখে নির্বাচন কোনো নতুন খবর নিয়ে আসতে পারে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যেখানে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছি আমরা, সেখানে শুধুমাত্র নির্বাচন আমাদের মুক্তি এনে দেবে– এই চিন্তা সঠিক নয়।

আবার, গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক ব্যাপার নয়। নির্বাচন ঠিকমতো হলেই এটা বোঝায় না যে সেদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এটা ঠিক, নির্বাচনটাও যদি ঠিকভাবে না হয়, তাহলে এটা বোঝা যায় যে, সেদেশে গণতন্ত্রের বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ রক্তমাংস নিঃশেষিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে এ যুগে একমাত্র চেনা যায় তার শরীরের নির্বাচনের পোশাক দেখে, সেটাকেও সে আজ খুলে ফেলেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আবির্ভূত হয়েছে আজ নগ্ন ও ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদের রূপে।

### বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে

দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের শাসনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ থাকলেও, মাঝে মাঝে ফেটে পড়লেও – নেতৃত্বহীন অবস্থায় তা একসময় স্তিমিত হবে। কিংবা একটা সরকার পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেলেও সেই একইরকম আরেকটি সরকার ক্ষমতায় আসবে। মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেলেই একমাত্র জনগণের মুক্তির রাস্তা বের হতে পারে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি বুর্জোয়াশ্রেণীর দলগুলো গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে না। গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারে একমাত্র বামপন্থী শক্তি। বামপন্থীদের দুটি বড় জোট গণতান্ত্রিক বামমোর্চা ও সিপিবি-বাসদ মিলে বৃহত্তর বামঐক্য গড়ে তুলেছেন। ঐক্যের ঘোষণায় আশু ও দীর্ঘমেয়াদী বেশকিছু কর্মসূচী ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনমুখী না হয়ে ঐক্যকে নির্বাচনমুখী করার ব্যাপারে সিপিবি-বাসদ ও বামমোর্চার কয়েকটি দল তৎপর। এই দুই জোটে অবস্থানকারী বামপন্থীরা বিগত সময়ে যতগুলো জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন – সেখানে তাদের প্রাপ্ত ভোটকে যোগ করলেই বোঝা যায় নির্বাচনে বামপন্থীদের অবস্থা কী রকম। তারপরও বড় বুর্জোয়া দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা নির্বাচনে একটা অবস্থান তৈরি করতে পারবেন – একথা এখনও ভাবেন। এই কথাগুলো মিডিয়ায়ও এমনভাবে প্রচার করেন যেন মনে হবে বামপন্থীদের ঐক্যই হয়েছে নির্বাচন করার জন্য। তারা যেন নির্বাচনে জিতলে কিছু একটা করতে পারবেন। এটি একেবারেই একটি ভুল চিন্তা। তাদের উচিত ছিল সংসদীয় রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করা। কেবল এই উদ্দেশ্যেই বামপন্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা যত ক্ষুদ্র শক্তিই হই, সত্যিকারের মুক্তির পথ কোনদিকে – সেই সত্যটা আমরা বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরব। নিজেরাও চেষ্টা করবে সেই পথে লোক জড়ো করার। আমাদের বক্তব্য ও আবেদন সকল পরিবর্তনকামী মানুষকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব।

## গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ভিটেমাটি রক্ষার আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণ

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* উচ্ছেদের কবলে পরেছে ওই এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। অথচ আইন অনুযায়ী, বসত ভিটা- ফসলি জমিতে পাওয়ার প্ল্যান্ট করার কোনো অনুমতি নেই। এই এলাকারই লাটশালার চরে প্রচুর অনাবাদী অকৃষি জমি পরে থাকা স্বত্ত্বেও শুধু মাত্র কোম্পানির খরচ কমানোর জন্য দখল করে নিচ্ছে মানুষের বাস্তুভিটা, কৃষিজমি। সোলারপ্ল্যান্ট নির্মাণ করতে ইতোমধ্যে ওই এলাকায় শুরু হয়েছে ভূগর্ভস্থ বালি উত্তোলন, যা সেখানকার পুরো কৃষি জমির ধ্বংস ডেকে আনছে।

এলাকাবাসী বাস্তুভিটা ও আবাদী জমি রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা, জেলা প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন সময়ে দাবি জানিয়ে এসেছে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার। প্রশাসন তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি। ফলে স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সালমান এফ রহমান, যার বিরুদ্ধে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ আছে, রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ আছে, তার কোম্পানি বেক্সিমকো সুন্দরগঞ্জে সোলার প্ল্যান্ট করতে সরকারের সাথে চুক্তি করেছে। জনগণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার সমস্ত শর্ত লঙ্ঘন করে এই প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ চলছে।

সরকার জনগণের দাবির প্রতি তোয়াক্কা না করে, শত শত মানুষের ভিটে মাটি, ফসলি জমির দিকে দৃষ্টিপাত না করে বেক্সিমকো কোম্পানির হয়ে মানুষের ভিটে মাটি রক্ষার আন্দোলনে গুলি চালিয়েছে। ঠিক একই ভাবে গুলি চালিয়েছিল চট্টগ্রামের বাশখালীতে। দেশের অধিকার সচেতন মানুষের আজ তাই উপলব্ধি করা প্রয়োজন – এই শাসকরা আসলে কার পক্ষে?

*গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মোট মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার দাবিতে ঢাকায় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল*

**পিইসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে চাঁদপুরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে**

# বাম্পার ফলনও যাদের জীবনে পরিবর্তন আনে না

*(১ম পৃষ্ঠায় পর)* একজন আলুচাষীর সাথে। বললেন, 'আলুর বস্তা ছোট করা হয়েছে। এখন একেকটি বস্তায় ৫০ কেজি আলু ধরে। অথচ বস্তাপ্রতি কোল্ডস্টোরেজ ভাড়া ১৫০ টাকা-ই আছে'। অর্থাৎ বস্তাপ্রতি আলুর পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে কোল্ডস্টোরেজ ভাড়া আগের মতই রাখা হয়েছে। হাইকোর্টের এক রিটে কৃষকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কোল্ডস্টোরেজে আলুর বস্তা ৫০ কেজি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু ভাড়া কমানোর ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

ব্যক্তি মালিকানাধীন কোল্ডস্টোরেজে সিন্ডিকেট ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দাপটে আলু চাষীরা আলু রাখতে পারেন না। কোল্ডস্টোরেজগুলো আগে থেকেই মালিকের দখলে থাকে। ফলে চাষীরা আলু রাখার জায়গা না পেয়ে সস্তা দরে তাদের কাছেই বিক্রি করে দেয়। বিভিন্ন এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চাষীরা যেসব সার, বীজ ও কীটনাশক কেনে, সেগুলো অনেকক্ষেত্রে নিম্নমানের হওয়ায় উৎপাদনে বিপর্যয় নেমে আসে। এই বছর রংপুরে নিম্নমানের বীজ ও ভেজাল কীটনাশকের কারণে উৎপাদন কম হয়েছে বলে অভিযোগ চাষীদের। উত্তরাঞ্চলে যখন ৫-১০ টাকা দরে আলু বিক্রি হচ্ছে তখন রাজধানীসহ দেশের শহরাঞ্চলে আলুর দাম কেজিপ্রতি ২০-২৫ টাকা। বাজার অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে মধ্যসত্ত্বভোগীরা বিশাল অঙ্কের মুনাফা লুটছে। অন্যান্য সবজি ও রবিশস্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

২০১৪ সালে আমাদের সংগঠন 'সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট' এর আহ্বানে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। রাস্তা অবরোধ করে শত শত কৃষক দেশবাসীর বিবেকের কাছে এই প্রশ্নই রেখেছে, নিজের গায়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে সমস্ত মানুষের আহার যোগায় যে কৃষক, দিনান্তে সেই কিনা থাকে উপবাসী? এ অন্যায় অবিচার আর কতদিন চলবে?

আন্দোলনের অর্জন হিসেবে- এ বছর জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের আলুচাষীরা উৎপাদন খরচ পেয়েছে। আলু বিক্রি করে মণপ্রতি গড়ে ২৪-২৫ হাজার টাকা এসেছে। 'ডায়মন্ড' জাতের আলুতে সামান্য লাভও হয়েছে চাষীদের। ধারাবাহিকভাবে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত আছে। আমাদের সংগঠন দাবি করে, হাট-বাজারে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আলু ক্রয় করতে হবে। যাতে মধ্যসত্ত্বভোগীরা এখান থেকে মুনাফা লাভের সুযোগ না পায়। এছাড়া কোল্ডস্টোরেজের ভাড়া কমিয়ে তা সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত করা এবং সার, বীজ ও কীটনাশকের দাম কমানো।

পুঁজিবাদ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের আলুচাষীরাও এই ব্যবস্থার নিপীড়নের শিকার। একদিকে চাষীদের দুর্দশা অন্যদিকে এ থেকে ফায়দা লুটছে ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরেরা। কিন্তু আশার ব্যাপার হলো- আলুচাষীরা রাস্তায় নামছে। তারা জীবন থেকে এ শিক্ষাই নিয়েছে যে, সংগ্রাম-ই মানুষকে শক্তি দেয়।

# বিউটি আক্তার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাবুল মিয়া ও তার সহযোগীরা। এক মাস আটকে রেখে বিউটিকে ধর্ষণ করে। এরপর বিউটিকে তার বাড়িতে রেখে পালিয়ে যায় বাবুল মিয়া। এর আগে ঘটে আরেকটি ঘটনা। ব্রাহ্মণডোরা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। যাতে অংশ নেয় বাবুল মিয়ার মা কলমচান বিবি এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ময়না মিয়ার স্ত্রী আছমা বেগম। নির্বাচনে কলমচান বিবি জেতেন। তখন থেকে ময়না মিয়া এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সুযোগ এসে যায় যখন জানাজানি হয় কলমচান বিবির ছেলে বাবুল একটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ময়না মিয়া বাবুলকে ফাঁসাতে বিউটিকে খুন করার পরিকল্পনা করে। ময়না মিয়া বিউটির বাবা সায়েদ আলীকে বোঝায় যে, বিউটি নষ্ট হয়ে গেছে। সে বেঁচে থাকলেই বরং সায়েদ আলীর অসুবিধা। সমাজের নানা কথা শুনতে হবে। মেয়ে হত্যার প্রস্তাবে রাজি হয় বাবা। এরপর গত ১৬ মার্চ ময়না মিয়া, সায়েদ আলী ও অপর এক ব্যক্তি মিলে বিউটিকে খুন করে এবং শায়েস্তাগঞ্জের হাওরে লাশ ফেলে দেয়।

না, এটা কোনো সিনেমা-উপন্যাসের কাল্পনিক গল্প নয়। পুলিশের কাছে ময়না মিয়া ও সায়েদ আলীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেই উঠে এসেছে এই ভয়াবহ রোমহর্ষক ঘটনাটির বর্ণনা। স্বাধীনতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব এই শব্দগুলো যেন অপমানিত হয়ে ফিরে আসছে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীর মুখের দিকে চেয়ে।

বিউটি আক্তারের হত্যাকাণ্ড প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে এ যাবৎকালের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে – ধর্মীয় মূল্যবোধ, পারিবারিক আবেগ, গণতান্ত্রিক চেতনা সবকিছু। সায়েদ আলী ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। বিউটি ছিল তার মেয়ে। পারেননি তিনি সেই মূল্যবোধ বা আবেগ দিয়ে বিউটিকে রক্ষা করতে। বাবুল মিয়া কিংবা ময়না মিয়া আমাদেরই চারপাশে বসবাস করা একেক জন। এদেশের আলো-বাতাসেই বড় হওয়া। কীভাবে তারা পারলো একমাস ধরে একটি মেয়েকে নির্যাতন করতে কিংবা নিজের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য খুন করতে? এরপরও কী শুনতে হবে এ দেশ গণতান্ত্রিক? এদেশে আইনের শাসন আছে? আজ যদি বিউটির মতো কোনো কিশোরী এসে রাষ্ট্রের কর্তাদের সামনে বিউটির এমন পরিণতির জন্য প্রশ্ন করে, তারও এমন হবে কি না জিজ্ঞাসা করে – পারবেন কি তারা চোখ তুলে কথা বলতে? ন্যূনতম নৈতিকতা থাকলেও কেউ পারবে না। বিউটি আক্তারের লাশের ছবি যেন এই ব্যর্থ রাষ্ট্রটিরই একটি ভগ্ন প্রতিচ্ছবি।

বিউটি আক্তারের ঘটনাটিকে মুখোশ খুলে দিয়েছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। বাবুল মিয়া একমাস ধরে বিউটিকে আটকে রেখে নির্যাতন করলেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। বিচার হওয়া তো সুদূর পরাহত। এই বিচারহীনতার পরিবেশই এরকম অসংখ্য বাবুল মিয়ার জন্ম দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গত ১৬ বছরে ধর্ষণের মামলা হয়েছে ৪,৫৪১টি। এর মধ্যে মাত্র ৬০টি মামলায় দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পেয়েছে। এখনো নিষ্পত্তি হয়নি ৩,৩১২টি মামলা। যখন ৭৩ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয় না বছরের পর বছর, তখন তো স্বাভাবিকভাবেই অপরাধের মাত্রা বেড়ে চলে। নতুন নতুন বাবুল মিয়াদের জন্ম হয়। এর দায় কার?

হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ময়না মিয়া এদেশের চূড়ান্ত নোংরা অধঃপতিত রাজনীতির আরেক চরিত্র। যে ক্ষমতার জন্য মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করেনা। সে এমন এক রাজনীতি করে যেখানে ক্ষমতায় যাবার জন্য বা টিকে থাকার জন্য যেকোন অনৈতিক কাজও জায়েজ। রাজনীতির প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সে একটি নিরাপরাধ মেয়েকেই কেবল খুন করেনি, মেয়ের বাবাকেও জড়াতে পেরেছে এমন চূড়ান্ত গর্হিত একটা কাজে। কতটা নীচ হলে এমন কুকর্ম করা যায়! ময়না মিয়ার মতো খুনীরা প্রতিনিয়ত লালিত-পালিত হয় এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির ছায়াতলে।

বিউটি আক্তারের বাবাও তার ধর্মীয় নৈতিকতা দিয়ে মেয়েকে রক্ষা করতে পারেননি। এ সমাজ তাকে শিখিয়েছে ধর্ষিত একজন নারী মানে সে 'নষ্ট মেয়ে'। ধর্ষণের জন্য ধর্ষক নয়, দায়ী ধর্ষিতা নিজেই। ধর্ষিতা একজন পাপী। সায়েদ আলী মেয়েকে খুন করে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করলেন যেন! বিবেক-মনুষ্যত্ববোধ জাগলো না, মেয়ের করুণ আর্তনাদও উপেক্ষা করতে পারলো সমাজের কটুবাক্য থেকে বাঁচতে। সায়েদ আলীর মতো চিন্তা করা মানুষ আমাদের সমাজে কি খুব কম?

বিউটি আক্তারের মৃত্যু অপরাধী করে গেল গোটা সমাজকে। এমন করুণ মৃত্যু প্রশ্ন করে গেল আমাদের 'মানুষ' নামের পরিচয়।

# যাদের হাত চললে পেট চলে

*(১ম পৃষ্ঠায় পর)* বছরে তিন মাসের কাজ থাকে, নয় মাসের কোনো কাজ নেই। কাজের সন্ধানে দেশের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ভেসে ভেড়ায়। অনেকের ঠিকানা থাকে, অনেকের তাও নেই। স্কুল-কলেজের বারান্দা, বাস টার্মিনাল, প্ল্যাটফর্ম, পার্কের বেঞ্চ, ফুটপাত – এইসবই ঠিকানা। নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে – দেশের কোনো এক জেলায় বাড়ি ছিল, এখন নেই। যাদের বাড়ির ঠিকানা আছে, তারা প্রিয় বউ-বাচ্চার সাথে থাকতে পারে না। বছরের অধিকাংশ সময়ে কাজের জন্য বাইরে থাকে। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের মতো নিজ বাড়িতে আসে, ৬/৭ দিন থাকে। আবার চলে যায়। যে টাকা নিয়ে আসে দু-একদিন বউ-বাচ্চা নিয়ে ভালো খায়; নিয়ে যাওয়া সুদের টাকা শোধ করে। যাবার সময় আবার মহাজনের কাছে সুদে টাকা নেয়। কিছু স্ত্রীকে চলার জন্য দেয়, যাবার ভাড়া বাবদ নিজে কিছু নিয়ে যায়। এনজিও, মহাজনী সুদের কিস্তির জালে আটকে থাকে প্রত্যেকের জীবন। কিস্তির কারণে কারও ঘর ভাঙ্গে, স্বামী-স্ত্রীর তালাক হয়। কেউবা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়ে। আর ফিরে আসতে পারে না। অনেকে পাগল সাজে, যাদের একটু আত্মসম্মান বোধ আছে তাদের অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ইট ভাটার মৌসুমে ভাটা মালিকের দালালদের কাছে অনেকেই ৬ মাসের জন্য দাদন নিয়ে বিক্রি হয়। মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই। অমানুষিক খাটুনিতে পালাতে পারে সন্দেহে অনেককে ভাটায় শিকল দিয়ে বেধে রাখে। কাজের ক্ষেত্র যত লম্বা, শিকলও তত লম্বা হয়। যাকে বলা যায়, দাস যুগের নতুন সংস্করণ।

দিন মজুরের একটা বড় অংশ বাইরে যায়। রিক্সা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ি চালায়। গৃহকর্মসহ নানা স্বকর্মে নিয়োজিত থাকে। বস্তিতে গাদাগাদি করে থাকে। তাদের প্রতিদিনের যে কষ্টকর জীবনযুদ্ধ তা বর্ণনা করতে ভুক্তভোগীদের চোখে জল গড়ায়। পরিবহনে এদের উপহাস করে ডাকা হয় 'মফিজ'। সিটে এক ভাড়া, দাঁড়িয়ে আরেক ভাড়া, ছাদে আরেক ভাড়া। ছাদে ঘুমের ঝোঁকে যেন না পড়ে যায়, সেজন্য অনেকে পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেধে নেয়। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে এদের লাশ বাড়িতে পৌঁছায় না, পরিবার-পরিজন অনেকে খবরও জানতে পারে না। অসুখে চিকিৎসা নেই। ঝাড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজই ভরসা। ফলাফল অকালেই কুকুর শেয়ালের মতো মৃত্যু। সন্তানদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, আনন্দ এদের জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো। থাকার ঘরটাকে ঘর বলা যায় না। ঝড়-বৃষ্টির দিনে সৃষ্টিকর্তাকে তাদের জপতে হয়।

শখ থাকলেও নতুন কাপড় পরনে জোটে না। বয়স্ক, শিশু যারা তাদের অনেকেই মোটা কাপড়ের অভাবে শীতে মারা যায়। অর্ধাহার, অপুষ্টিজনিত কারণে অল্প বয়সেই এরা বৃদ্ধ হয়। শরীর অচল হলে ভিক্ষাবৃত্তি এদের যেন নিয়তি। কেউ এদের দায়িত্ব নেয় না। না রাষ্ট্র, না সমাজ। এদের ছেলেমেয়েদের একশ জনের মধ্যে প্রায় সবাই রোগাক্রান্ত। পরিবার বলে বন্ধন নেই। স্ত্রী এক জায়গায় কাজ করে, মেয়েটা হয়তো কারও গৃহকর্মী, ছেলেটা চায়ের দোকানে আর নিজে হয়তো কোনো শহরে কাজ করে। সবাই বিচ্ছিন্ন। ঈদ-পূজা-পার্বনে তারা এক হতে পারে।

এই মানুষদের সংখ্যায় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। এদের শরীর-ঘামে-রক্তে দেশ, সমাজ, সভ্যতা টিকে থাকে। অথচ এদের কথা কেউ মনে করে না। এদের জীবনকে মানুষের জীবন বলা চলে না। অনিরাপদ, অনিশ্চিত অন্ধকারে ঢাকা। এদের সংখ্যা দেশে কত তার কোনো তালিকা নেই। নারী-পুরুষ মিলে এরাই দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। দেশের বিদ্যমান ধনীর স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থা এদেরকে প্রতিদিন ছোবরা বানাচ্ছে।

# আবারও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) লোকসান কমানো, অপচয় রোধ ইত্যাদির অজুহাত দেখায়। কিন্তু এর পিছনের কথা সরকারের দুর্নীতি, ভুল জ্বালানি নীতি, জনগণের পকেট কেটে মুনাফা করার মনোভাব, ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফার সুযোগ করে দেয়া।

গ্যাস উৎপাদনের ১১ শতাংশ পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার কাজে সরবরাহ করা হয়। গ্রাহকদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির। সে সময় পাইপ লাইনের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে মূলত মানুষকে এলপিজি সিলিন্ডারের উপর নির্ভরশীল করার অপচেষ্টা চলে – যা এখনও অব্যাহত। বর্তমানে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবসা মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের হাতে কুক্ষিগত। সরকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় এ হেন সিদ্ধান্ত নেয়, যা জনস্বার্থ বিরোধী। গত কয়েকবছরে দফায় দফায় বেড়েছে গ্যাসের দাম। যদিও গ্যাস খাত এখনো লাভজনক অবস্থায় রয়েছে।

গ্যাসের দাম বাড়লে পণ্যের প্রত্যক্ষ উৎপাদন খরচ ও পরোক্ষ পরিবহন খরচ বাড়বে - বাড়বে পণ্যের দাম। ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত খরচ তুলবেন কিন্তু শেষবিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জীবন। সরকারের ভুল জ্বালানি নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণ যেন আদালতে যেতে না পারে সেজন্য তৈরি করা হয়েছে 'দায়মুক্তি আইন' – যা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ বিধান ২০১০ নামে পরিচিত।

গ্যাস খাতে উন্নয়নের জন্য এ মুহূর্তে প্রয়োজন গ্যাস রপ্তানিমূলক সকল চুক্তি বাতিল, জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের কাজের সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। স্থল ও গভীর-অগভীর সমুদ্রে নিয়মিত অনুসন্ধান জোরদার করা প্রয়োজন। সরকার যদি জাতীয় সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়, তবে এলএনজি আমদানির মতো ব্যয়বহুল প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম বলেছেন, "দেশের স্থলভাগের ও সমুদ্রসীমায় জ্বালানি অনুসন্ধান ও উত্তোলন বাড়ানো হলে এলএনজি আমাদানি দরকার হত না। আমদানির ফলে জ্বালানির দাম বাড়তে থাকলে অর্থনীতি ও জনজীবনের সবক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে।' (তথ্যসূত্র : ৯ মার্চ '১৮, দৈনিক প্রথম আলো)

সামনে জাতীয় নির্বাচন। এ নির্বাচনের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সরকার একদিকে যেমন মূল্যবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জনগণের পকেট থেকে সরাসরি অর্থ কেড়ে নিতে চায়, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের লুটপাটের সুযোগ করে দিয়ে বিনিময়ে লুটের টাকার ভাগ পেতে চায়। সম্প্রতি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে নতুন করে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। এতে প্রতি লিটার কেরোসিনে ১১ টাকা, ডিজেলে ৭ টাকা ও ফার্নেস অয়েলে ১৩ টাকা বাড়াতে বলেছে। (৫ এপ্রিল '১৮, দৈনিক বণিক বার্তা) এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। শেষ করছি প্রথম আলোর অনলাইন পেজে একজন পাঠকের মন্তব্য দিয়ে – "জীবন দুর্বিসহ। দয়া করে আমাদের কাছ থেকে আর অর্থ কেড়ে নিয়েন না।"

# এই 'উন্নয়নশীল' লইয়া আমরা কী করিব?

*(১ম পৃষ্ঠার পর)* টাকা খরচ করে। যদিও এই 'উন্নয়নশীল' স্বীকৃতি আসার জন্যে আমাদের ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর এখানেই শেষ নয়। তার পরের তিন বছর, অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে একটি কৌশলপত্র তৈরি করে বাংলাদেশ তা বাস্তবায়ন করবে। তবেই জাতিসংঘের ঘোষণা ও মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে।

২০২৪ সালে গিয়ে আমরা যে স্বীকৃতি পাব তার জন্য এরই মধ্যে জনগণের টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আতশবাজি, হাতিরঝিলে আলোকসজ্জাসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী বহু আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের ৫৭টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে শোভাযাত্রা করে যোগ দিয়েছেন। এসব শোভাযাত্রায় স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদেরও পথে নামানো হয়েছিল।

### উন্নয়নশীল দেশ আসলে কী?

২০১৫ সালের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক একটি ঘোষণায় প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আর গত মার্চ মাসে জাতিসংঘের এক ঘোষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বে তিন ধরনের দেশ রয়েছে – উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত (এলিডিসি)। জাতিসংঘ হিসাবটি করে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা বা সংকট সূচক অনুযায়ী।

এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের হিসাব ভিন্ন। মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় দিয়ে বিবেচনা করা বিশ্বব্যাংকের ভাগগুলো হলো – নিম্ন আয়, মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশ। মধ্যম আয় আবার দুই রকম – নিম্ন-মধ্যম আয় এবং উচ্চ-মধ্যম আয়।

মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৫ ডলার বা তার নিচে হলে সেই দেশগুলো বিশ্বব্যাংকের বিবেচনায় নিম্ন আয়ের দেশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেকে ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার পর্যন্ত হলে সেগুলো মধ্যম আয়ের দেশ। আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেকে ৪ হাজার ১২৫ পর্যন্ত হলে তা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, আর ৪ হাজার ১২৬ থেকে ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার পর্যন্ত হলে সেটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২ হাজার ৭৩৬ ডলারের চেয়ে বেশি হলেই তখন দেশটি উচ্চ আয়ের দেশ হিসাবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ ডলার। সুতরাং এ হিসাবে বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্যম আয়ের মধ্যে আছে। ২০২৮ সালের মধ্যে কি আমরা এই মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ১২৬ ডলারে নিয়ে যেতে পারব?

### জাতিসংঘের মানদণ্ড

জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সূচক তৈরি করে থাকে। তারই ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ – তিন শ্রেণিতে ভাগ করে সিডিপি। বাংলাদেশসহ ৪৮টি দেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় আছে। প্রতি তিন বছর পরপর জাতিসংঘের সিডিপি এ তালিকায় থাকা দেশগুলোর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে।

প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাংক বা জাতিসংঘ এই যে উন্নয়নের সূচকগুলো নির্ধারণ করে এবং পরিমাপ করে সেগুলো কি সমালোচনার ঊর্ধ্বে? কোনোভাবেই নয়। বিশেষত মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা। একজন দরিদ্র রিকশাচালক, পৃথিবীর সবচেয়ে কম মজুরি পাওয়া গার্মেন্ট শ্রমিক কিংবা ফসলের ন্যায্যমূল্য বঞ্চিত কৃষকের আয় আর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লোপাট করে দেওয়া কিংবা শত শত গার্মেন্ট শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিতকারী এবং রাষ্ট্রীয় বহু সুবিধা ভোগকারী মালিকের আয়কে এক কাতারে দাঁড় করানোর তাৎপর্য কী?

### মেকাপের নিচে

আমাদের 'উন্নয়ন' হচ্ছে অনেকটা মেকাপের মতো যা দিয়ে আমাদের চেহারার কুৎসিত দিকটাকে আড়াল করা হয় মাত্র। এই মেকাপের একটি হলো মাথাপিছু গড় আয়।

সিপিডির এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গত ছয় বছরে যখন জিডিপি বাড়ছে তখন সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা, আর সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে ১০৫৮ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের এই সূচকটি আসলে উন্নয়ন, আইনের শাসন, মানুষের ভালো থাকা, খারাপ থাকা এসবের কিছুই বোঝায় না।

১৬ কোটি মানুষের দেশে ঠিক কতজন মানুষ ১ হাজার ৬১০ ডলার আয় করেন? আর শুধু আয় তো মানুষের জীবনের অপরাপর চাহিদাগুলোর নিশ্চয়তা দেয় না। বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত চার বছরে এদেশে ধর্ষণে শিকার হয়েছে ১৭ হাজার নারী ও শিশু। এখানে প্রতিদিন বিউটি-তনু-পূজাদের জীবন ও সম্মান আমাদের সামনে খবর হয়ে আসে। আন্তর্জাতিক একটি জরিপে ঢাকা পৃথিবীর সপ্তম বিপজ্জনক শহর। যৌন সহিংসতায় ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। ২০০২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যাসংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর ৯৭ শতাংশেরই কোনো সাজা হয়নি। 'সুষ্ঠু তদন্ত', 'দ্রুত তদন্ত', 'সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়া' ইত্যাদি প্রায় সব কটি সূচকেই বাংলাদেশের স্থান নিচের দিকে।

'নাগরিক নিরাপত্তা'র বেলাতেও বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩টি দেশের মধ্যে ১০২। প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় মরছে গড়ে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। বছরে গড়ে ৭০০ শ্রমিক নিহত হচ্ছেন, আহত হচ্ছেন ১ হাজার ৩০০ জন।

'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারে' বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে! সামগ্রিকভাবে 'আইনের শাসনে' ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২। খেলাপি ঋণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ 'নম্বর ওয়ান'! নয় বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ।

পরিবেশ সুরক্ষায় ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯! ভয়াবহ ক্ষতিকর সালফার ডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনো-অক্সাইড নির্গমনেও ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম আর সিসার দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা বলছে, ঢাকায় সিসাদূষণের শিকার ছয় লাখ মানুষ (বেশির ভাগই শিশু) এবং দেশের ১ কোটি ২৭ লাখ মানুষের দেহে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি (অর্থাৎ ক্যান্সার জাতীয় রোগ) ঘটছে। এ ছাড়া পরপর কয়েক বছর ধরেই ঢাকা পৃথিবীর সবচেয়ে বসবাস-অনুপযোগী শহরগুলোর মধ্যেও অন্যতম শীর্ষে।

*[তথ্যসূত্র : সত্যিই সেলুকাস, এ এক অদ্ভুত উন্নয়নের দেশ! - মাহা মির্জা; ২ এপ্রিল '১৮/ উন্নয়ন, দুর্নীতি ও জিডিপি : একসঙ্গে বাড়ার রহস্য কী - মাহা মির্জা, ৩ এপ্রিল '১৮; প্রথম আলো]*

### এই উন্নয়ন লইয়া আমরা কি করিব?

বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বাক্য অমরত্ব লাভ করেছে : 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' এই বাক্যের বহু অনুকরণ হয়েছে, তবু এর উপযোগিতা শেষ হয়নি। আমাদেরও বলতে ইচ্ছে হয়, 'এই উন্নয়ন লইয়া আমরা কি করিব?' এই দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হোক বা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হোক তাতে কি এদেশের সাধারণ মানুষ, নারী-শিশু, কৃষক-শ্রমিক, পাহাড়-সমতলের মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটছে? বা অদূর ভবিষ্যতে আদৌ ঘটবে কি?

# রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে খাদের কিনারায় ব্যাংকিংখাত

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)* আরেকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে সরকারি তহবিল রাখার হার দ্বিগুণ করেছে। আগে সরকারি সংস্থাগুলোর তহবিলের ৭৫ ভাগ সরকারি ব্যাংকে এবং ২৫ ভাগ বেসরকারি ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা রাখত। অর্থমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে এখন থেকে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে ৫০ ভাগ। অর্থাৎ সরকারি ব্যাংকের সুবিধা কমিয়ে দ্বিগুণ বাড়ানো হলো বেসরকারি ব্যাংকের টাকার যোগান। মনে হতে পারে – কী এমন সমস্যা তাতে? এর আগে জলবায়ু তহবিল হিসাবে ৫০৮ কোটি টাকা ফারমার্স ব্যাংকে রেখেছিল সরকার। কিন্তু সেই টাকা ফেরত দিতে পারছে না আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যাংকটি। এই পরিস্থিতি জানার পরও কেন সরকারি তহবিল বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখার সিদ্ধান্ত নিল সরকার? উত্তর একটাই। ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করা, নির্বাচনে লুটেরা গোষ্ঠীকে পাশে রাখা। একই সাথে অল্প কিছু মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করার অবাধ সুযোগ তেরি করে দেয়া।

নির্বাচনের বছরে এমনিতেই ৭০/৮০ হাজার কোটি টাকা টাকা পাচার হয়ে যায়। এই পাচারের বড় অংশ হয় আমদানির মাধ্যমে। ওভার ইনভয়েস অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যের যে দাম তার চেয়ে বেশি দেখিয়ে টাকা পাঠানো হয় বিদেশে। মূল্য পরিশোধের পর বাড়তি টাকা কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশে পাচার করেন ব্যবসায়ীসহ বুর্জোয়া রাজনৈতিকরা। বিশ্বজুড়েই টাকা পাচারের সহজ পন্থা হিসেবে ওভার ইনভয়েসকে ধরা হয়। এছাড়াও হুন্ডির মাধ্যমেও অর্থপাচার হচ্ছে অহরহ।

ডিসেম্বরে নির্বাচন, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদসহ ব্যবসায়ীরাও এ সময়ে পুঁজির নিরাপত্তায় অর্থপাচার বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে আরও হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের সুযোগ তেরি করে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায় আওয়ামী লীগ সরকার। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের স্বপরিবারে প্রধানমন্ত্রীর চা খাওয়ার আমন্ত্রণে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়েছে। ব্যাংকিংখাতের নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা ঠেকাতে কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে, দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণ লুটেরাদের জন্য সবুজ সিগন্যাল, সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজি পাচারসহ সম্পদ অল্প কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত পুঁজিবাদী শাসন শোষণের পুরানো কৌশলের নতুন রূপ মাত্র। মুখে জনগণের কথা, টেকসই উন্নয়নের কথা বললেও আসলে এসব যে ফাঁকা বুলি, তা বুঝতে ব্যাংকিংখাতের এসব জনস্বার্থবিরোধী পরিকল্পনা দেখলেই বোঝা যায়।

# স্টিফেন হকিংস
# বিজ্ঞানের আকাশে ধ্রুবতারা

৮ জানুয়ারি ১৬৪২, সৌরজগতের ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়া বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি এদিন মৃত্যুবরণ করেন। তার ঠিক তিন শতক পরে ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারিতে অক্সফোর্ডে জন্ম হয় আরেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর; যিনি পুনর্বার আমাদের সামনে মহাকাশের গঠন এবং বিকাশের রহস্যকে অনেকটাই উন্মোচিত করে তাকে শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধাবী হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হকিং। নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই কলেজের গণ্ডি পেরোন তিনি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে পাস করে পিএইচডি করতে চলে যান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসেই তাঁর মোটর নিউরনের জটিল রোগ ধরা পরে। তরুণ স্টিফেনের বয়স তখন মাত্র ২১ বছর। আর দু'টো বছর বাঁচবেন কিনা এই নিয়ে তাঁর চিকিৎসকরা যখন সন্দিহান জীবনের এমন কঠিন মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়ান জেইন ওয়াইল্ড। জেইনের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা তাঁকে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে।

মারাত্মক শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি সফলভাবে তাঁর গবেষণা কাজ শেষ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সৃষ্টিতত্ত্বে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সম্প্রসারিত প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনিই প্রথম দেখান যে কৃষ্ণগহ্বর অতল ঝুড়ির মতো সমস্ত কিছু (এমন কী আলো পর্যন্ত) কেবল শুষেই নেয় এমন নয়, এখান থেকে বিকিরণ বের হবার ঘটনাও ঘটে। বৃহদাকার বস্তুদের রাজ্যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব আপেক্ষিকতা আর অতি ক্ষুদ্রদের ধর্ম অব্যর্থভাবে বর্ণনাকারী কোয়ান্টাম তত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি 'সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণগহ্বরের' তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করান, যাতে একই সাথে প্রায় অসীম ভর এবং খুবই ক্ষুদ্র আয়তনকে বিবেচনায় আনতে হয়।

বিজ্ঞানচিন্তায় নিবেদিত প্রাণ হকিং সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর অর্জিত জ্ঞান পৌঁছে দেয়া নিয়েও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মানুষ যাতে সহজে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে পারে সেই ভাবনা থেকেই ১৯৮২ সালে কালজয়ী গ্রন্থ 'A Brief History of Time' রচনার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ১৯৮৪ সালে বাকশক্তি হারিয়ে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়ে কোমাতেও চলে যান তিনি। তবু তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে শেষপর্যন্ত ১৯৮৮ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে এভাবেই প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি আজীবন। এবং অনেক সুস্থ স্বাভাবিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও যা বিরল, একটি হুইল চেয়ারে শারীরিকভাবে বন্দী থাকা সত্ত্বেও মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সপক্ষে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন তিনি। ছোট বয়সেই মার সাথে অংশ নিয়েছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও একই ভূমিকায় আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি বারবার। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদস্বরূপ ইসরায়েল বয়কট আন্দোলনেও অংশ নিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের আওতায় নিয়ে আসার জন্যে অনেক গণশুনানি, সেমিনারে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এই বিজ্ঞানীকে যখন যন্ত্রনির্ভর ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে মানুষের জন্যে শঙ্কার কারণ মনে করেন কিনা – এমন প্রশ্ন করা হলে বলেন, বরং এর চেয়ে পুঁজিবাদের বিপদকে বড় করে ভাবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে যন্ত্র দ্বারা আমাদের সমস্ত কিছু উৎপাদিত হলেও তাঁর ফলাফল মূলত নির্ভর করবে বন্টন ব্যবস্থার উপর। যদি তাতে আমাদের সকলের সমান অংশীদারিত্ব থাকে তবেই কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হবার আশা করা যায়। কিন্তু যদি যন্ত্রের মালিকরা তার একচ্ছত্র দখল নেয়, তবে তাঁর আশঙ্কা ছিল, তাতে করে বৈষম্য বরং আরও বাড়বে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই বিজ্ঞানী কপিরাইটের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানাতে নিজের পিএইচডি থিসিসকে সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে গেছেন। গ্যালিলিওর মৃত্যু তিথিতে জন্ম নেয়া মহৎপ্রাণ অনুসরণীয় মানুষটির মৃত্যু ঘটে এ বছরের ১৪ মার্চ, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মদিনে, যার নামে তাঁকে তাঁর বন্ধুরা কলেজ ভার্সিটিতে ডাকত!

# রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে খাদের কিনারায় ব্যাংকিংখাত

ঢাকা শহরে হরহামেশাই ফুটপাতে চলছে মোটর সাইকেল। মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধে নগরপিতারা ফুটপাথের মাঝে বসিয়েছে পিলার। কোথাও বাঁশ, কোথাও লোহার পাইপ আবার কোথাও রোড ডিভাইডারের ব্যবহৃত সিমেন্টের মোটা মোটা পিলার। আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। অথচ আইনের প্রয়োগ না করে উল্টো বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে পথচারীদের চলাচল। একটু অসতর্ক হলেই পিলারের আঘাতে ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে রাতে এটা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। মানুষের নির্বিঘ্নে হাঁটাহাঁটির জন্য ফুটপাথ যেখানে আরও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন, তখন উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ।

ঠিক একইভাবে উল্টো পথে চলছে ব্যাংকিং খাত, চালানো হচ্ছে। ব্যাংকের ঋণ খেলাপি, জনগণের আমানতের হাজার হাজার কোটি লোপাটকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের জন্য নিয়ম-কানুন শিথিল করেছে সরকার। দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে একের পর এক ব্যাংক যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা লোপাটের সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার। ব্যাংকিংখাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ আমানতকারীকে পথে বসাবে।

নির্বাচনের বছরে সরকার তহবিল যোগান নিশ্চিত করতেই যে এমন উদ্যোগ নিয়েছে তা বুঝতে কাউকে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেয়ার ক'দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। ওইদিনই প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৬০ কোটি টাকা দেয়ার খবরও তুলে ধরেছে সংবাদ মাধ্যমগুলো। হাজার হাজার কোটি টাকা পেলে নিশ্চয় এমন উপঢৌকন দিতে কার্পণ্য করবে না ব্যবসায়ীরা!

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানত ১০০ টাকার সংগ্রহ করলে গড়ে ৮৫ টাকা ঋণ দিতে পারবে। গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাংকগুলোকে আমানতের সাড়ে ৬ ভাগ টাকা নগদ আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। নগদ-জমা বাধ্যবাধকতা বা সিআরআর (ক্যাশ রির্জাভ রেশিও) ব্যাংকিংখাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত। অথচ সম্প্রতি বেসরকারি ব্যাংক উদ্যোক্তাদের বৈঠকে সিআরআর এক ধাক্কায় এক শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ৫ শতাংশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এর ফলে ব্যাংক ব্যবসায়ীরা বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সুযোগ পাবে।

এখানেই শেষ নয়, নির্বাচনের বছরে আরও সুবিধা দিয়েছে সরকার। নগদ টাকার সংকট হলে কেন্দ্রিয় ব্যাংক থেকে এক সপ্তাহের জন্য টাকা ধার নিতে পারে ব্যাংকগুলো। এ ধার করার জন্য যে সুদ দিতে হয় তা ব্যাংকিং ভাষায় 'রেপো' হিসেবে পরিচিত। সেই রেপোর সুদ হার পৌনে একভাগ কমিয়ে ৬ শতাংশ করেছে কেন্দ্রিয় ব্যাংক। এতে করে ব্যাংকগুলো টাকা ধারের খরচ আগের তুলনায় অনেকাংশে কমবে।

জনগণের আমানত লুটপাটের *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স

ফ্রান্সের ইমানুয়েল ম্যাক্রন সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে ফ্রান্স। গত মার্চের ২২ তারিখ ফ্রান্সের ৭টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ আহবানে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এদিন ধর্মঘটের সমর্থনে দেশের ১৮০টি বিক্ষোভ সমাবেশে প্রায় ৪ লক্ষের অধিক বিক্ষোভকারী অংশ নেয়।

ধর্মঘটে চালক-কর্মচারি-শ্রমিকরা অংশ নেয়। এ বিক্ষোভে ছাত্ররাও যুক্ত হয়। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সংহতি জানানোর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ সংকুচিত করা, উচ্চশিক্ষাকে ব্যয়বহুল করার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ করে। শুধু প্যারিসেই ৪৮০০০ বিক্ষোভকারী অংশ নেয়। প্যারিসে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্যারিস কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সে মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর পরই ম্যাক্রন সরকার শ্রম আইন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। সরকারের পরিকল্পনায় আছে ২০২২ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ১,২০,০০০ শ্রমিক-কর্মচারি ছাঁটাই করা হবে। পূর্বের শ্রম আইনে শ্রমিকরা যেসব অধিকার ও চাকুরির নিরাপত্তা ভোগ করতো, তা সংকুচিত করা হচ্ছে। স্থায়ী চাকরির বদলে স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক নতুন শ্রমিক নিয়োগ, বেকারত্ব, ইনস্যুরেন্স সংস্কার, অবসরের বয়স কমানো, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের উপর উচ্চ ট্যাক্স আরোপ, অবসর ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা কমানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত রেলখাত সংস্কার ও লোকসান কমানোর কথা বলে অভিজ্ঞতা নয়-মেধার ভিত্তিতে মজুরি, মূল্যস্ফীতির সাথে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির নিয়ম বাতিল, রেল কর্মচারিদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে রেলভ্রমণের সুবিধা সংকোচনসহ অনেক শ্রমিক স্বার্থবিরোধী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে রেলখাত বেসরকারিকরণের দিকেই ফ্রান্স হাঁটছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মন্দা ফ্রান্সকে চেপে ধরেছে। এ মন্দা কাটাতে অন্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই ক্রমাগত অর্থনীতির সামরিকীকরণের দিকে হাঁটছে।

সম্প্রতি ফ্রান্স বাজেটে সামরিক খাতে ব্যাপক ব্যয় বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। সামরিক বাহিনীকে নতুন জেনারেশনের অস্ত্রে সজ্জিত করা, ইরাক-লিবিয়া-সিরিয়ায় এবং আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে তার সামরিক উপস্থিতি, রণহুঙ্কার তারই অংশ। এ কারণেই ফ্রান্সের পুঁজিপতি শাসকরা সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কমাচ্ছে। শ্রমিকের অধিকার, চাকুরির নিরাপত্তা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে অধিকার সবগুলো একে একে কেড়ে নেওয়ার আয়োজন চলছে। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শ্রমিকরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এবারের ধর্মঘট থেকে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে।

ফ্রান্সের এই অধিকার সচেতন ও লড়াকু শ্রমিকশ্রেণি বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রেরণা হয়ে থাকবে।

## জনগণের পকেট কাটতে
# আবারও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারা

আবারও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান আবুল মনসুর মো. ফয়েজউল্লাহ জানান, "শুধু শিল্প-কারখানা নয়, অন্যান্য শ্রেণির ব্যবহারকারীর গ্যাসের দর আনুপাতিক হারে বাড়বে।" (তথ্যসূত্র : ৪ মার্চ, দৈনিক প্রথম আলো) এর অর্থ সরকার জনগণকে নতুন করে ভোগান্তিতে ফেলতে চায়। সরকার গ্যাস খাতের সংকট মোকাবেলার নামে বিভিন্ন দেশ থেকে এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানির পরিকল্পনা করেছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে রাস গ্যাস কোম্পানির সাথে চুক্তির আওতায় দৈনিক ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাস আমদানি হবে। যা আগামী ১৫ মে'র মধ্যে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হওয়ার কথা। এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত করে তা ব্যবহৃত হবে। এজন্য পেট্রোবাংলা এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন করার জন্য সরকারের ঘনিষ্ঠ সামিট গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানি প্রা: লি:' এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'অক্সিলারেট এনার্জির' সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বর্তমানে দেশে উৎপাদিত গ্যাসের দাম পড়ছে প্রতি হাজার ঘনফুট ২.২ ডলার। কিন্তু প্রতি হাজার ঘনফুট আমদানিকৃত এলএনজি'র দাম পড়বে ৭/৮ ডলার। এতে বছরে গ্যাস কেনা বাবদ খরচ হবে দেড় বিলিয়ন ডলার। সরকারের দাবি অনুযায়ী বেশি দামের গ্যাসের সাথে বিদ্যমান গ্যাসের দামের মূল্য সমন্বয় করতেই এ মূল্যবৃদ্ধি। পর্যায়ক্রমে ২০২৫ সালের মধ্যে আরও ৪০০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ এলএনজি আমদানির ব্যাপারে সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করবে। (তথ্যসূত্র : ৪ মার্চ, দৈনিক প্রথম আলো)

আমদানিকৃত এলএনজি দেশে এলে শিল্পে প্রতি ঘনফুট গ্যাসের দাম হবে ১৪.৯০ টাকা। বর্তমানে ৭.৭৬ টাকা – যা প্রায় দ্বিগুণ। সিএনজি যার বর্তমান মূল্য প্রতি ঘনফুট ৩২ টাকা তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৫১.৭০ টাকা। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম যা বর্তমানে ছিল প্রতি ঘনফুট ১৭.৪ টাকা তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৩৫ টাকা। অন্যদিকে এক চুলা গ্রাহকের মাসিক বিল যা আগে ছিল ৭৫০ টাকা তা বেড়ে হবে ১০০০ টাকা এবং দুই চুলার গ্রাহকের যা আগে ছিল ৮০০ টাকা তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০৫০ টাকা। (তথ্যসূত্র : ৯ মার্চ, দৈনিক প্রথম আলো)

এলএনজি আমদানির সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম ঢাকা টাইমসকে বলেন, "সরকার যেভাবে এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা করছে তা আমাদের জ্বালানি ভারসাম্য ও অর্থনীতিতে বিরাট একটা আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।... কিন্তু যেভাবে এই গ্যাস আসবে তা অতি উচ্চমূল্যের। এটা দেশে একটা বিরাট 'প্রাইস শক' (মূল্য দুর্ভোগ) ঘটাবে।"

প্রতিবার মূল্যবৃদ্ধির প্রাক্কালে সরকার বিশ্ববাজারের দামের সাথে সমন্বয়, ভর্তুকি, *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# নির্বাচন
# জনগণকে মুক্তি দিতে পারে না

কাছাকাছি চলে আসা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানারকম আলোচনা চলছে গোটা দেশ জুড়ে। আওয়ামী লীগের ভয়াবহ দুঃশাসনে মানুষের ক্ষুব্ধতা কোনো ফাঁক পেলেই ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোটা সংস্কারের আন্দোলনেও আমরা তার আভাস পেলাম। তাই নির্বাচনের আলোচনা এখন অন্যরকম মাত্রা পাচ্ছে। বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, না করবে না? আওয়ামী লীগ কি আপেক্ষিক অর্থে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাবে, নাকি ৫ জানুয়ারির মতো আরেকটি নির্বাচন করবে? এইরকম কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে নির্বাচনের আলোচনা।

সুষ্ঠু নির্বাচন বলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এখন কিছু নেই, ব্রিটেন-আমেরিকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত কোথাও তার ছায়াটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে আশাও কেউ করে না। এখন যেটা হয় – সেটা হলো তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন। এর মানের হলো, ভোটদাতাদের একটা বড় অংশ যাতে কেন্দ্রে গিয়ে ভোটটা দিতে পারেন, রিগিং যাতে বল্গাহীন না হয়, অর্থাৎ যাতে মোটামুটি অর্থে বেশ কিছু লোক (তাদের উপর নির্বাচনের আগে ও পরে ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা অর্থের যত প্রভাবই থাকুক না কেন) ভোটবাক্সে নিজে যেন সিল দিয়ে ব্যালটটি ফেলতে পারেন। এটাকেই আমাদের দেশে আজ তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা হয়। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' এমন একটি চমৎকার মডেল তৈরি করেছে যে, এই তুলনামূলক সুষ্ঠু নির্বাচনও আদৌ হবে কিনা সেটাই এখন একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**আওয়ামী লীগ কীভাবে এই নির্বাচনটি সম্পন্ন করতে চায়?**

এই প্রশ্নটা আজ আলোচনা করতে হচ্ছে। অথচ বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে নির্বাচনের ধারণা এনেছে তাতে এই প্রশ্ন ওঠারই কোনো কথা ছিল না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার শুরুর সময়ে Of the people, by the people, for the peole বলে গণতন্ত্রের যে স্লোগান নিয়ে এসেছিল তা এখন দুনিয়াতে আর কোথাও কাজ করে না। নির্বাচনে টাকা, পেশিশক্তি ও মিডিয়ার প্রভাব সকল দেশেই থাকে, কোথাও কোনোটা কম, কোনোটা বেশি। বাংলাদেশের নির্বাচনে এই তিনের প্রভাব রেখেই শুধু ভোট দেয়ার ভিত্তিতে যে তুলনামূলক সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণা এসেছে– তাও এখন আর কাজ করছে না। ভোটের আগে ভোট কেনা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, মিডিয়া ম্যানিপুলেশন বজায় রেখে কেবলমাত্র ব্যালট পেপার বাক্সে ঢোকানোর যে ক্ষমতাটা মানুষের হাতে ছিল, যাকে মোটা দাগে তার ভোটাধিকার বলা হয় – সেটাও আজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। এর জন্য এখন মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে।

আগামী নির্বাচন আমাদের উপরের সংজ্ঞানুসারে যদি তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু হয় তাহলে জনরায় আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যেতে পারে। আওয়ামী লীগ এ ঝুঁকি নিতে চাইবেনা– এটাও *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

**সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।**
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org